# একশো বছরের চা-বাগান 'মিশন হিল' উত্তরের অহঙ্কার

ডানকান চা সাম্রাজ্যের সংকট মালিকের সৃষ্টি! সমাধানের পথ তাই আজ দূর অস্ত?

ডুয়ার্স স্পেশাল
সৌরভ গাঙ্গুলি ও ব্যোমকেশ

# এখন ডুয়ার্স

১৬-৩১ জুলাই ২০১৭। ১২ টাকা

## অনিশ্চিত আগামী

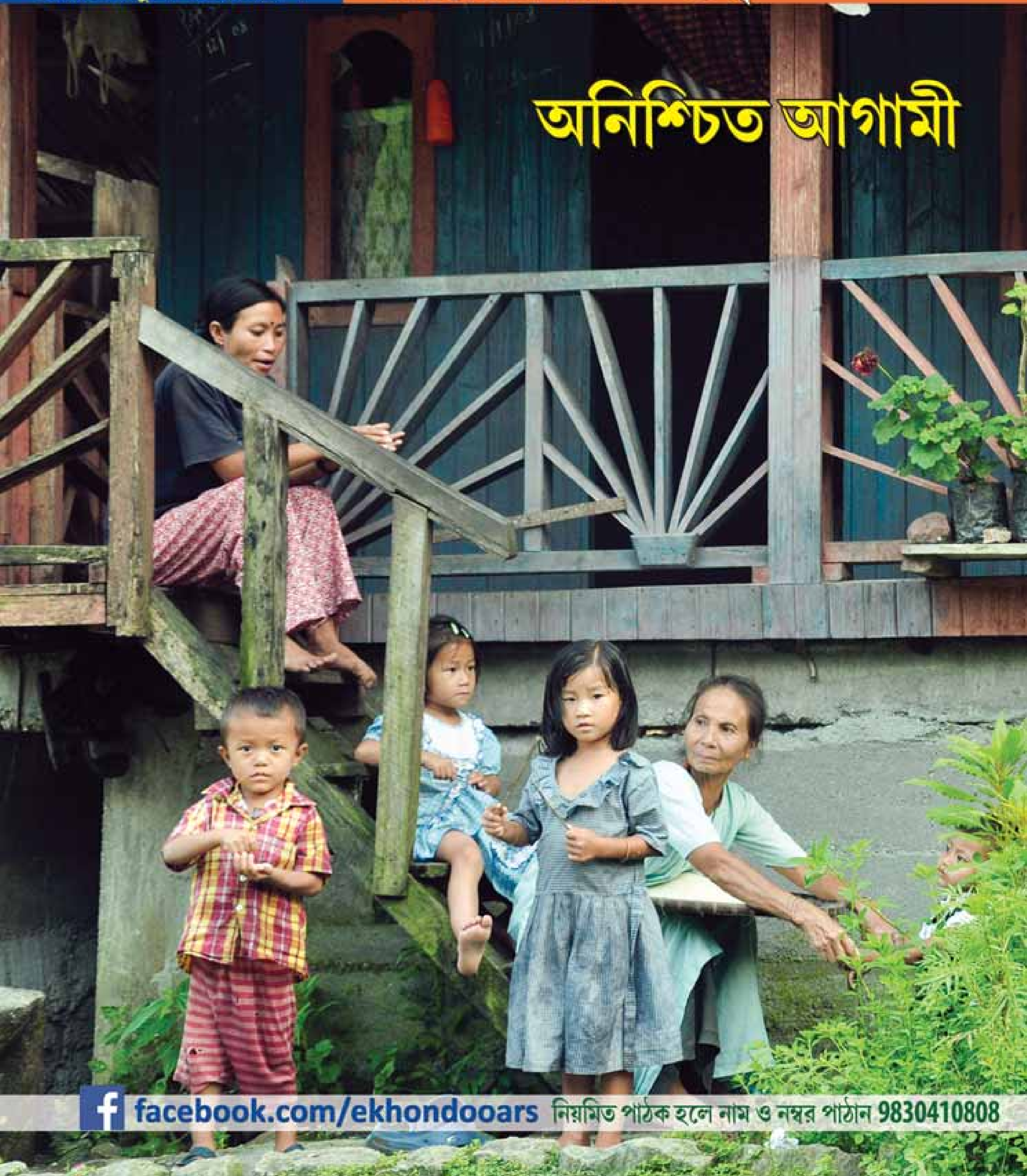

facebook.com/ekhondooars নিয়মিত পাঠক হলে নাম ও নম্বর পাঠান 9830410808

অত্যাধুনিক জীবনযাত্রা আমাদের জীবনকে অনেক স্বাচ্ছন্দ্যময় করে দিয়েছে, কিন্তু তার সাথে অনেক অসুখও এনে দিয়েছে।
তার মধ্যে **কোষ্ঠকাঠিন্য** অন্যতম.................

## কোষ্ঠকাঠিন্য এড়াতে ৪ টি টিপস্ ঃ-

১. প্রচুর জল খান, প্রতিদিন অন্তত ৩ লিটার।
২. দৈনন্দিন খাবারে ফাইবারযুক্ত খাবারের মাত্রা বাড়ান।
৩. মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলুন।
৪. রোজ অন্তত ৩০ মিনিট শরীর চর্চা করুন।


*Issued for the public interest by* **Pharmakraft**
*From the makers of :*
**PICOME** Susp.

# কফি হাউস ? ক্লাবঘর ?
# নাকি আরও অনেক কিছু ?

**চা-টা। আড্ডা। দাবা-ক্যারম-টেবিল টেনিস। পার্টি। গেট টুগেদার।**
**সেমিনার। বেড়াতে যাওয়ার বইপত্র ও বুকিং।**

সোম-শুক্র বেলা ১টা থেকে রাত ৯টা। শনি-রবি বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা
ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭
পরিচালনায় NEST SOCIETY (Regn. No. S/2L/5822 of 2013-14)

# আড্ডাঘর

মুক্তা ভবনের দোতলায়, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি - ৭৩৫১০১
ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

যে কেউ সদস্য হতে পারেন। যে কেউ যোগ দিতে পারেন।
**এককালীন সদস্য নেওয়া হচ্ছে**

# এখন ডুয়ার্স প্রকাশিত বই

## পর্যটনের বই

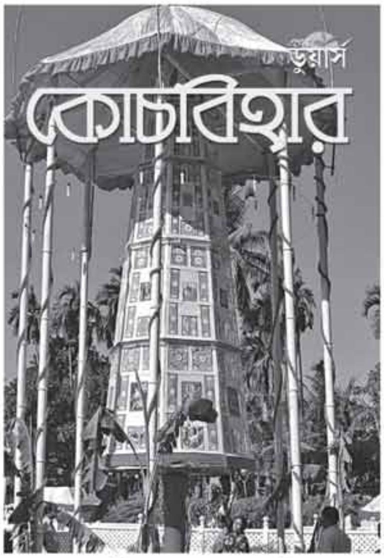


কোচবিহার। মূল্য ২০০ টাকা

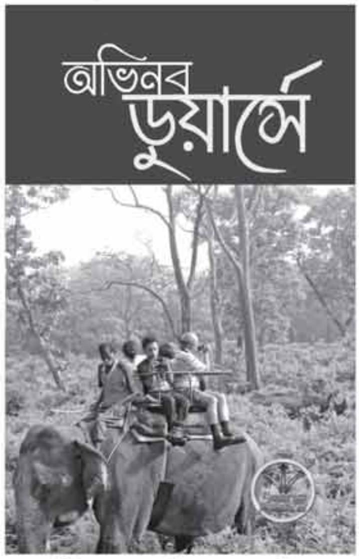


অভিনব ডুয়ার্সে। মূল্য ২০০ টাকা

## চা-শিল্পের বই

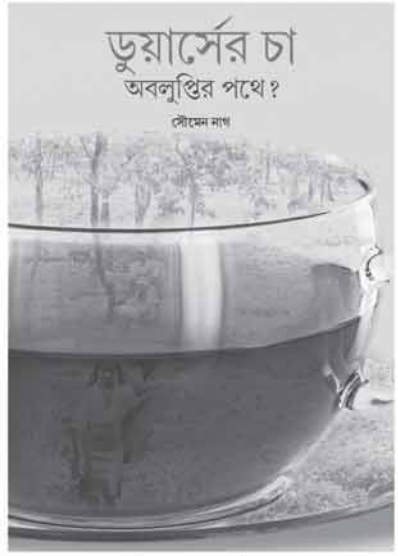


ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ। মূল্য ১৫০ টাকা

## সাহিত্যের বই

বসন্তপথ।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর উপন্যাস
মূল্য ১০০ টাকা

চারপাশের গল্প
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প সংকলন
মূল্য ১০০ টাকা

লাল ডায়েরি।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর গল্প সংকলন
মূল্য ১৫০ টাকা

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা
মূল্য ৫০০ টাকা

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস
মূল্য ২৫০ টাকা

সবক'টি বইয়ের ডুয়ার্সে প্রাপ্তিস্থান

আড্ডাঘর।
মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড,
জলপাইগুড়ি

## সম্পাদকের ডুয়ার্স

# টুরিজম একটি জরুরি পরিষেবা?

আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধির পাঠানো সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী (খবরেও প্রকাশ!) ডুয়ার্স-তরাই-পাহাড়ের ১৩০০ হোমস্টে পাহাড়ের 'অচানক' অযাচিত অশান্তিতে অর্থনৈতিকভাবে ভয়ংকর ক্ষতিগ্রস্ত। অতএব পাহাড়ি দরিদ্রদের কথা মাথায় রেখে সেই হোমস্টেগুলির জন্য পর্যটন পরিষেবা চিকিৎসা বা দমকলের মতোই জরুরি পরিষেবা হিসেবে চালু রাখা হোক— এই মর্মে প্রেস মারফত বন্‌ধকারীদের কাছে আবেদন রেখেছেন জনৈক বিশিষ্ট পর্যটন বিশেষজ্ঞ, যাঁর নাম, তর্কের খাতিরে হলেও ধরতে হবে, সমতলের পর্যটনমহলে যতটাই সুপরিচিত, ততটাই তাঁর 'খ্যাতি' পাহাড়ের কোণে কোণে সুবিদিত! অতএব তাঁর আবেদন পর্যটনের স্বার্থে যে বন্‌ধকারীরা বিবেচনা করে দেখতে পারেন তা ভাবাটা একেবারেই অন্যায় কিছু নয়। কেবল বন্‌ধ সমর্থকদের কাছেই নয়, তিনি নাকি দরবার করেছেন দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও। ভাবটা যেন, 'পর্যটনের স্বার্থে' দিল্লি তাদের পাহাড়ি 'অনুজ'দের মৃদু বকুনির সুরে অনুরোধ করলেই কাজ হয়ে যাবে ম্যাজিকের মতো! তবে হ্যাঁ, রাজনীতিতে 'অসম্ভব' বলে যখন কিছু নেই, তখন তা সম্ভব হলেও হতে পারে।

হোক বা না হোক, সেই তর্কে আজ যাচ্ছি না। সেই মাননীয় পর্যটন বিশেষজ্ঞ, যিনি নাকি পূর্ব হিমালয়ের গ্রামীণ পর্যটনে প্রথম প্রদীপটি জ্বালিয়েছিলেন বলে দাবি করেন, ইকো পর্যটনে যাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরে গিয়ে মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে, পর্যটনে নানা অবদানের জন্য যাঁর শোকেসে পুরস্কার রাখার আর জায়গা নেই, সেই স্যারকে কতিপয় প্রশ্ন করার ধৃষ্টতা সামলাতে পারছি না। প্রথম প্রশ্ন, পর্যটনকে জরুরি পরিষেবা হিসাবে ছাড় দেওয়ার 'বাতুলতা' বন্‌ধ সমর্থকরা কেন করতে যাবে? 'টুরিস্ট' স্টিকার লাগিয়ে হইহই করে সব গাড়ি পাহাড়ে ঢুকতে শুরু করবে বলে? আর তাঁর সেই আহ্বানে কলকাতা থেকে কাতারে কাতারে টুরিস্ট নির্ভয়ে আসতে শুরু করবে? কেবল হোমস্টে চালু রাখলেই হবে? সাইট সিয়িং না রাখলেও চলবে? পানীয় জলের বোতল, চা-স্ন্যাক্সের দোকান বন্ধ থাকলে টুরিস্টের চলবে? দোকানপাট বন্ধ থাকলে হোমস্টের রান্নাবান্নাই বা চলবে কী করে? নিজেদের র‍্যাশনেই যখন টান পড়ছে, তখন অতিথিসেবা কি সম্ভব? বিশ্বের নানা প্রান্তে বহু নান্দনিক পর্যটনস্থল উগ্রবাদের লাল চাহনিতে বিপর্যস্ত— কোথাও কি আপনি টুরিজমকে জরুরি বা আপৎকালীন পরিষেবার মধ্যে রাখতে দেখেছেন বা শুনেছেন? সেরকম হলে তো সেই পর্যটনের সংজ্ঞাই পাল্টে হবে 'টেরর টু রিজম'!

আর তার চাইতেও বড় প্রশ্ন, বন্‌ধের নামে, আন্দোলনের নামে টুরিজমের ক্ষতি চলবে না— এই দাবি তোলার অধিকার আসলে কার? বলাই বাহুল্য, সে অধিকার কেবল সেই পাহাড়ের মানুষেরই, কারণ বাইরের পর্যটন কারবারিরা সেই প্রশ্ন তুললে তাকে স্বার্থান্বেষী দাবি ছাড়া আর কিছু তকমা দেওয়া যায় না। আর বাকি রইল সমতলের মধ্যবিত্ত পর্যটক, পাহাড়ের বন্‌ধে যাদের বেড়ানোর পরিকল্পনায় কিছু আসে যায় না। কাশ্মীরে আজ যতই অশান্তি চলুক, পর্যটকরা যাতে অবাধে নিশ্চিন্তে ছুটি কাটাতে পারে, তার জন্য কাশ্মীরের স্থানীয় মানুষের উদ্যোগের খামতি নেই। পর্যটকদের সুরক্ষার জন্য তৎপর স্থানীয় ট্রাভেল এজেন্ট, হোটেল মালিক, কর্মচারী, গাড়ির ড্রাইভার। 'টুরিস্ট আমাদের দানাপানি জোটায়, অতএব টুরিস্টকে যে কোনও মূল্যে সুরক্ষিত রাখতে হবে!' এই চেতনা এসেছে তাদের নিজেদের মধ্যে আপনা-আপনি, যার বিরোধিতা করছে না সেখানকার বিক্ষোভকারীরাও। কিন্তু সেসব সত্ত্বেও কাশ্মীরের পথে আজ টুরিস্ট কোথায়?

বাংলার পাহাড়েও সেই ডাক ওঠা চাই ভিতর থেকেই। বাইরের কোনও পর্যটন ব্যবসায়ী বা বিশেষজ্ঞর এ ধরনের আহ্বানের তাই কোনও 'নিউজ ভ্যালু' নেই। তবে একে অর্বাচীন প্রস্তাব বলা যায় না মোটেই, কারণ এর পিছনে রয়েছে কোনও সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা। পাহাড়ি মানুষের ক্ষোভ-যন্ত্রণা আজকের নতুন কিছু নয়। এতদিন ধরে তিনি পাহাড়ের ঘরোয়া পর্যটন প্রসারে কাজ করে চলেছেন, পর্যটন যদি বিক্ষুব্ধ পাহাড়ি হৃদয়ে মলম লাগাতে পারে, তবে তার প্রভাব বাংলার পাহাড়ে চোখে পড়ল কই? তাহলে কি বড়ই বেয়াদব আমাদের পাহাড়িরা?

আসলে গত দশ-পনেরো বছর ধরে যা জনপ্রিয় করতে কালঘাম ছুটেছে, বর্তমান রাজ্য সরকারের খোলামেলা নীতিতে সেই হোমস্টের প্রবল প্রসার ঘটেছে হাল আমলে। পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনার মতোই পাহাড়ে মধ্যবিত্ত সচ্ছলরাই কেবল তার মুনাফা তুলছেন, যার ভাগীদার সমতলের কারবারিরা। এর মধ্যে পাহাড়ের দারিদ্রমোচন কিংবা অধিকারবোধ বা চেতনার উন্মেষ— এসব কোনও 'কিতাবি' ব্যাপার নেই। গুরুংরা সম্ভবত এই সত্যটা ভাল করে বুঝে গিয়েছেন। তাই মুষ্টিমেয় হোমস্টে মালিক নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। আর পাহাড়ের প্রকৃত দরিদ্রদের নিয়ে আলাদা চিন্তার কারণ নেই, কারণ দরিদ্রদের নতুন কিছু পাওয়ার বা হারাবার কোনও ঘটনা ঘটেনি।

চতুর্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ১৬-৩১ জুলাই ২০১৭

### এই সংখ্যায়

**সম্পাদকের ডুয়ার্স** ৫
**চায়ের ডুয়ার্স, ডুয়ার্সের চা** ১২
ডানকান চা সাম্রাজ্যের সংকট মালিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি! সমাধানের পথ তাই আজ দূর অস্ত?
**উত্তরপক্ষ** ৮
উত্তরবঙ্গে তাঁতশিল্পের উন্নয়নের জন্য একটা মাস্টার প্ল্যান দরকার
**ডুয়ার্স তরাই শতাব্দী এক্সপ্রেস** ১৭
একশ' বছরের পুরনো চা-বাগান 'মিশন হিল' উত্তরের অহঙ্কার
**এখন ডুয়ার্স স্পেশাল**
ডুয়ার্সে ব্যোমকেশ ও ওয়ান নাইনটি মার্সিডিজ! ১৯
বালুরঘাটে সৌরভ গাঙ্গুলির মূর্তি ভাস্কর শিলিগুড়ির সুশান্ত পাল ২১
**পর্যটকের ডুয়ার্স**
জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজদিঘি ২২
জল আনে জিভে জলপাইগুড়ি ২৩
**ডুয়ার্স বিচিত্রা**
ডুয়ার্সের বিলুপ্তপ্রায় জনজাতি 'খারওয়ার' ৩৮
**ধারাবাহিক ডুয়ার্স**
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ১০
লাল চন্দন নীল ছবি ২৯
তরাই উৎরাই ২৪
ডুয়ার্স থেকে শুরু ৩২
ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস ৪৩
**নিয়মিত বিভাগ**
সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ৪০
খুচরো ডুয়ার্স ৬
ডুয়ার্সের ডায়েরি ৩৬
**শ্রীমতী ডুয়ার্স**
শ্রীমতীদের দাদাগিরি জারি ২৬
ডুয়ার্সের ডিশ ২৬
আন্তর্জাতিক রাগবিতে চা-বাগানের মেয়েরা ২৭
আপনার বাচ্চার প্রিয় খাদ্য চিকেন বিপদ ডেকে আনছে না তো? ৪২

**প্রচ্ছদ ছবি:** ডা. প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

**সম্পাদনা ও প্রকাশনা** প্রদোষ রঞ্জন সাহা
**ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান** শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
**সহকারী সম্পাদনা** শ্বেতা সরখেল
**অলংকরণ** শান্তনু সরকার
**সার্কুলেশন** দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
**ইমেল** ekhonduars@yahoo.com
**মুদ্রণ** অ্যালবাট্রস

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

# খুচরো ডুয়ার্স

## বুদ্ধিগজ

বীরপাড়া-মাদারিহাট এলাকার দুই চা-বাগানে হামলাবাজ হাতিরা নির্ঘাত তেইশটি পুষ্টিগুণসম্পন্ন পানীয় পান করে টলার-স্ট্রঙ্গার-শার্পার হয়েছে। এদ্দিন তাদের হামলা আটকাতে পাহারা দিয়ে বেশ ফল পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু ইদানীং পাহারাবাবুদের নাকানিচোবানি খাওয়াতে শুরু করেছে শুঁড়বাবুরা। পুব দিকে পাহারা থাকলে তারা হাজির হচ্ছে পশ্চিম দিক দিয়ে। দক্ষিণে পাহারা থাকলে হানা দিচ্ছে উত্তরে। পাহারাবাবুরা সংখ্যায় মোটেই বেশি নয়। উত্তর আটকালে দক্ষিণ ফাঁকা হয় তাই। তবে বুদ্ধি করে গজবাবুদের হানা দেওয়ার দিকটা অনুমান করে এদ্দিন সামলে আসছিলেন। কিন্তু এ যুগের হাতি তো, অ্যাডভান্স না হয়ে যায় না। তাই জঙ্গলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখে নিচ্ছে পাহারাবাবুদের দিক। তারপর হানা দিচ্ছে উলটো পথ ধরে। ফলে গত কয়েকদিনে ডজন দুয়েক বাড়ি ধূলিসাৎ! চাল-ডাল-আটা-হাঁড়িয়ার পরিমাণ তো হিসেবই করা যাচ্ছে না!

## স্পাই হানা

বালুরঘাট আর গঙ্গারামপুরে তেনারা প্রায়ই আসছেন ইদানীং। গেরস্ত সক্কাল সক্কাল চা খেয়ে কমোডে বসতেই দেখছেন পাশেই তিনি। আলমারি খুলে গিন্নি ডালের বাটি বার করতে গিয়ে আবিষ্কার করছেন তেনার আটপেয়ে লম্ফ। নবদম্পতির খাটেও নাকি তিনি নজর রাখছেন জুলজুল চোখে। সব মিলিয়ে যাচ্ছেতাই কাণ্ড গো! কীটনাশকের জ্বালায় নিজেদের বাপ-ঠাকুরদার বসতবাটি ছেড়ে তেনারা দলে দলে হাজির হচ্ছেন দোপেয়েদের ঘরে। আট পায়ে তুর্কিনাচন নাচাচ্ছেন দোপেয়েদের! এইসব অলপ্পেয়ে ট্যারেন্টুলার দল এখন ঘোল খাওয়াচ্ছে দুই শহরের পাবলিককে। যদিও গম্মেন্ট থেকে বলা হচ্ছে, ‘ঘাবড়াসনে বাপ! এ স্পাইডার কামড়ে দিলে একটু জ্বালাযন্ত্রণা হবে ঠিকই, কিন্তু পটোল তোলার কোনও চান্স নেই।’ কিন্তু গুজব ছেড়ে সত্যের দিকে কে বা কবে কান দিয়েছে দাদা! তাই ট্যারেন্টুলা মাকড়সা নিয়ে পটলোত্তোলনের আশঙ্কায় ঘেবড়ে গিয়েছে পাবলিক।

## মাছবিহার

কোচবিহারে মাছ বাড়ন্ত। গম্মেন্ট ঠিক করে ফেলেছে, জল পেলেই মাছ ছাড়বে।
নদী-নালা-পুকুর-খাল-বিল-নয়ানজুলি— যেখানেই জল, সেখানেই ছেড়ে দেওয়া হবে মাছের ছানা। অধিকাংশের অকালমৃত্যু ঘটবে ঠিকই, কিন্তু তারপরেও যা বেঁচে থাকবে, তাদের বধ করে ঝোল বানিয়ে খেলে মাছাভাব হবে নাকো সেখানে। শুনে মৎস্যপ্রেমীদের চোখে ঘুম নেই! উফ! সারা কোচবিহারে দৌড়াবে মাছ। অসময়ে অতিথি এলে আর চিন্তা নেই। খপ করে নালায় ছিপ ফেলে একটা কাতলা তুলে আনলেই হবে। জলের কল থেকে দু'-চারটে ট্যাংরা বেরিয়ে এলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। মৎস্য শিকারিরাও নাকি বড়শিতে শান দিতে বসে গিয়েছেন। শুধু অপেক্ষা জেলা জুড়ে মাছবিহার শুরু হওয়ার। এখন বেঁচে থাকা মাছগুলো বড়ো হওয়ার সুযোগ পেলে হয়!

## যাচ্চলে

নতুন চেয়ারম্যান বলে কথা। জেলার এ প্রান্ত-সে প্রান্ত থেকে তাই প্রাথমিক শিক্ষকরা হাজির হয়েছিলেন মালদায়। সঙ্গে ফুল-মালা-উপহার— মানে সংবর্ধনা দিতে যা যা লাগে আর কী। সংবর্ধনা তো চাকরিজীবনেরই অঙ্গ, তাই স্কুল ছেড়ে সবাই হাজির মালদায়। পরদিন হাজিরা খাতায় সই করে দিলেই চলবে। কিন্তু নয়া চেয়ারম্যান যে এমন বেরসিক তা কে জানত রে কাকা! অমন উৎসাহ, ভূরি ভূরি উপহার, মানপত্র, ফুলমালা— সব তুশ্চু করে দিয়ে বলে কিনা, ফিরে গিয়ে আজকের দিনটা সবাই সিএল নেবেন! স্কুল ফাঁকি দিয়ে কে বলেছে সংবর্ধনা দিতে মালদায় আসতে? কী কাণ্ড বলো দিকি? যার জন্য সম্মান, সে-ই বলে বেইমান! সিএল নিতে হবে জানলে ঘণ্টা আসতুম আমরা!

## যুগলে

মৌলানির পাবলিককে সে দিন খুব টেনশনে রেখে দিয়েছিল যুগলে। যুগলবন্দি অবশ্য কিঞ্চিৎ অন্যরকম। এক হনুমান আর এক চিতা। হনুবাবু শুরু করেছিল রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিজের হাতে, থুড়ি লেজে নিয়ে। তারপর মনুষ্যচালিত যানবাহনের বেনিয়ম দেখে বিরক্ত হয়ে এক গেরস্তের মুলোখেতে ঢুকে কোথায় জানি ভ্যানিশ হয়েছিল। পাবলিক ভারী আমোদ নিয়ে মুলোখেতে হনুসন্ধানে নামতে গিয়ে প্রায় মূর্ছা যায় আর কী! আগের রাতেই ঝমঝমে বৃষ্টিতে মুলোখেত জুড়ে কাদা। আর দাদা, সেই কাদায় ও কার পদচিহ্ন গো! এ যে চিতাবাবুর চরণচিহ্ন! অ্যাঁ! তবে বন দপ্তর যে বলেছিল, ফাঁদে পড়েছে ক'দিন ধরে ঘুরঘুর করা সেই চিতা! তবে? ব্যাস! হনুসন্ধান ছেড়ে পাবলিক ভ্যানিশ! আর ভ্যানিশ হতেই হনুবাবু কোত্থেকে বেরিয়ে বিচ্ছিরিরকম দাঁতখিঁচুনি দিয়ে আবার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে! এই

জন্যি কবি লিখেছিলেন, হনু-চিতা যুগলবন্দি, লোক নাচাবার নতুন ফন্দি!

## বিয়ের ফের

সবে বিয়েতে বসতে যাবেন ডাক্তারবাবু— এমন সময় বিনা অপারেশনে রক্তপাতের

মতো আসরে হাজির তাঁর পয়লা বউ। সঙ্গে দশ বছরের ছেলে। ব্যাস! বিয়েবাড়িতে হুলুস্থুল! বউ লুকিয়ে বিয়ের অভিযোগে খপাৎ করে ধরল পুলিশ। তবে পরদিন কী করে জানি জামিন পেয়ে দাঁত কেলিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন দাঁতের ডাক্তার। এর পর মামলা চলবে। যদ্দিন রায় না বার হয়, তদ্দিন দাঁত তুলতে বাধা কোথায়? কিন্তু পয়লা নম্বর বউ মোটেই ছাড়ার পাত্র নয়। বর জামিন পাওয়ার পরদিন তিনি আবার হাজির থানায়। এবার অভিযোগ শুনে পুলিশকর্তা প্রায় চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠেন আর কী! বউ পষ্ট ভাষায় জানাচ্ছে যে, তাঁর স্বামী মোটেই আসল ডাক্তার নয়। এক্কেবারে নকল দাঁতের মতোই ডুপ্লিকেট। ফলে আবার গ্রেপ্তার। এবার অবশ্যি জামিন হয়নি। হুঁ হুঁ বাবা! গ্রহের ফের তো জানতে, বিয়ের ফের কী বস্তু— এবার তা জানলে তো? স্থান আলিপুরদুয়ারের চুয়াখোলা।

## ওরে বাবা

নাগরাকাটা। ক'দিন গরমের পর বৃষ্টি হয়েছে। বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। মেয়েকে পাশে নিয়ে মনের সুখে ঘুমাচ্ছিলেন মা। পাকা ঘরের বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না আর ঝিঁঝির ডাক। হেনকালে সব কেঁপে উঠল থরথর করে। সঙ্গে সে কী হুড়মুড় শব্দ! ভূমিকম্প নাকি? চমকে গিয়ে চোখ খুলে পরিস্থিতি বুঝতে গিয়ে মায়ের চোখ কপালে! কী সাংঘাতিক ব্যাপার! লোহার খাট যে হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে! তদুপরি চারদিকে থইথই চাঁদের আলো! ভূমিকম্পের ঠেলায় কি খাট জানলা দিয়ে বেরিয়ে আকাশে উঠে যাচ্ছে? না না! তা তো নয়! অবস্থা তার চেয়েও কেরোসিন! দেয়াল ভেঙে শুঁড় ঢুকিয়ে খাট তুলে নিয়ে যাচ্ছে এক মহাহাতি! এর পর মূর্ছা যাওয়া ছাড়া আর কী-ই বা করার থাকে? তবে খাট সমেত মা-মেয়েকে বাইরে এনে আর কিছু করেনি হাতিবাবু। আকাশের নিচে নামিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে। তা এটা বুঝি হাতিদের হিউমার? ওরে বাবা!

## টুক্রাণু

জলদাপাড়ার কাছে এক গ্রামে গৃহপালিতের মতো দিন কাটাচ্ছে এক গন্ডার। বর্ষার ডুয়ার্সে পাকছে কাঁঠাল, আসছে হাতি, গেরস্ত চমকাচ্ছে। মোর্চার আন্দোলনে খাদ্যহীন সেবকের হনুমানরা পাবলিকের খাবার লুটছে। বাইসন পাকড়াতে আসছে নতুন গাড়ি, যার নাম 'বোমা'। আলিপুরদুয়ার শহর জুড়ে 'ছি ছি এত্তা

জঞ্জাল!' কালচিনিতে উদ্ধার গন্ডারের শিং, পরে জানা গেল নকল। দুরামারিতে ফিরে এল কেটে খাওয়া খাসি, খাদকরা মহাতঙ্কে। শিলিগুড়িতে রাতারাতি গলার স্বর বদল কিশোরের— পরিবারের দাবি, ভূতে ধরেছে। ডুয়ার্স জুড়ে বাইকের বদলে হেলমেট চুরির ধুম। 'লেজ কাটা মাকনা' নামে নয়া গুন্ডা হাতির উত্থান। বিষ ভেবে জোলাপ পান জয়গাঁর যুবকের— ফল ভাল হয়নি।

## এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

**শিলিগুড়ি**
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২

**শিবমন্দির**
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪

**জলপাইগুড়ি**
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩

**মালবাজার**
বিশ্বনাথ বাগচি ৯৮৩২৬৮৩৯৮৮

**চালসা**
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪

**বিন্নাগুড়ি**
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০

**বীরপাড়া**
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২

**লাটাগুড়ি**
বিশ্বজিৎ রায় ৯০০২৪০৯৮৯৩

**ময়নাগুড়ি**
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮

**ফালাকাটা**
অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯

**আলিপুরদুয়ার**
দীপক হোড় ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭

**কোচবিহার**
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
৯৮৫১২৩৪৮৮৯

**মাথাভাঙা**
নেপাল সাহা ৮৯৬৭৯৯৫৮৮৭

**মালদা**
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১

**রায়গঞ্জ**
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২

**বালুরঘাট**
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
**৯৮৩০৪১০৮০৮**

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
**০৩৩-২২৫২৭৮১৬**

# উত্তরবঙ্গে তাঁতশিল্পের উন্নয়নের জন্য একটা মাস্টার প্ল্যান দরকার

উত্তরপক্ষ

**প্রশান্ত নাথ চৌধুরী**

সেদিন মধ্য আষাঢ়। আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। আমি ও অনুজপ্রতিম দিলীপ বর্মা চূড়াভাণ্ডার গ্রামের অন্দরমহলে। পাট পচানো গন্ধে চারদিক ম ম করছে। বীজতলায় ধানের চারাগাছ যেন মাখনরঙা কার্পেট। ধান চাষের জমি তৈরির কাজ চলছে। এখন বলদে টানা লাঙল দিয়ে চাষ-আবাদ প্রায় হয় না। মাঠে ঘড়ঘড় শব্দে ট্রাক্টর ও পাওয়ার টিলার মাটি চৌচির করে দিচ্ছিল। গত এক দশকে একটা চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন উত্তরবঙ্গের গ্রামে এসেছে— খড়ে ছাওয়া ঘরবাড়ি প্রায় দেখাই যায় না। চকচকে টিনের চালের বাড়ি। সে টিন নাকি এমনই পাতলা, তার তুলনা চলে ঘুড়ি বানানোর কাগজের সঙ্গে। বাঁশ বা বাঁশ থেকে তৈরি সামগ্রী মহার্ঘ হওয়ায় এখন অনেক বাড়িতেই টিন দিয়ে ঘেরা। প্রত্যন্ত গ্রামেও টিনের চাল, সঙ্গে পাকা মেঝে ও দেওয়ালযুক্ত দু'-একটা বাড়ি দৃশ্যমান হয়।

আমরা বেশ কয়েকটি বাড়ির সমষ্টি নিয়ে একটা পাড়ায় প্রবেশ করলাম। সাক্ষাৎ পেলাম চন্দ্রমোহন মণ্ডলের। খুশিমোহন বড় ভাই এবং চন্দ্রমোহন ছোট ভাই— একই বাড়িতে সন্তানসন্ততি নিয়ে বাস। মাথার উপরে আছেন বিধবা বয়স্কা মা। এ পাড়ায় সাত-আট ঘর মানুষ তাঁতশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এঁরা ৩৫-৪০ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে এসে এই গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এঁদের ছিল অল্প পুঁজি। কাঁচা বাড়িতে মাথা গোঁজার ঠাই হল— দু'-তিন বিঘা জমি কিনে কৃষিকাজ শুরু করেছিলেন। চন্দ্রমোহনের পরিবার এসেছিল বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলা থেকে। ওই এলাকার তাঁতের শাড়ির খুব নামডাক। কিন্তু চন্দ্রমোহনরা অনেকেই তাঁতের কাজ জানতেন না। ওই অল্প পরিমাণ জমিতে পরিবারের ভরণপোষণ সম্ভব ছিল না। তাঁরা জানতেন, বর্ধমান জেলার ধাত্রী গ্রাম বা সমুদ্রগড়ে তাঁতশিল্পে অনেক শ্রমিক কাজ করে। ওঁরা শ্রমিকের কাজ নিয়ে বর্ধমান চলে আসেন। ধীরে ধীরে কাজ শিখে দক্ষ শ্রমিক থেকে অভিজ্ঞ তাঁতশিল্পীতে তাঁদের রূপান্তর ঘটে। আবার এই শিল্পে পরিবারের ছোটবড় সব সদস্যই কমবেশি কাজ করে থাকেন।

পরিবার-পরিজন ছেড়ে দূর দেশে কাজ করতে মন চাইত না। অল্প টাকা খরচ করে তাঁরা বাড়িতেই তাঁত বসালেন। কয়েকজন এই কাজ ছেড়েও দিলেন— মজুরি নাকি অত্যন্ত কম। বাড়িতে তাঁত বসিয়েও অনেকে লাভের টাকা চোখে দেখেননি। বর্তমানে চন্দ্রমোহন যে মেশিনে (তাঁত) কাজ করেন, তাকে টাঙ্গাইল (তাঁত) মেশিন বলে। অনেকাংশে 'চিত্তরঞ্জন' তাঁতের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বর্তমানে ওঁদের দুটো মেশিনে বয়নের কাজ হয়— তা ছাড়া পাড় তৈরির জন্য একটা জিগার মেশিন আছে। ওঁরা মূলত তৈরি করেন মেখলা, যা আসামের মহিলারা ব্যবহার করে থাকেন। উজ্জ্বল নীল কাপড়ে রুপালি ফুল তোলা, অনেক লম্বা চাদরের মতো অঙ্গবস্ত্র। অপূর্ব দেখতে। জানা গেল,

*এই প্রজন্মের তাঁত শিল্পী*

*তাঁতে তৈরি 'মেখলা'*

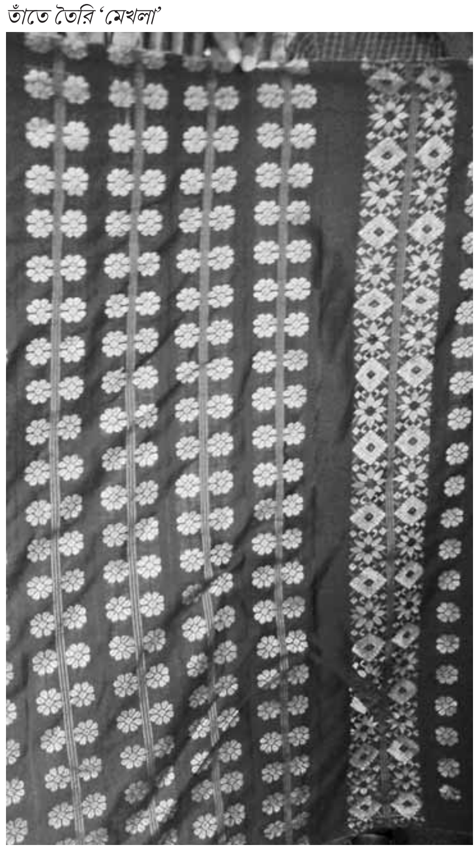

গুয়াহাটির মহাজনরা এই চাদরের মূল ক্রেতা। সুতরাং বিপণনের তেমন কোনও অসুবিধে নেই। তখন তাঁতে যে মেখলাটি বোনা হচ্ছিল, তার পাইকারি মূল্য ৮৫০ টাকা, সুতোর মূল্য ৩০০ টাকা, কারিগরের পারিশ্রমিক ৩৫০ টাকা এবং লাভ কমবেশি ২০০ টাকা। খুব সাধারণ মানের মেখলা একজন দিনে দুটো প্রস্তুত করতে পারে, কিন্তু সিল্কের নকশা কাটা মেখলা অনেক সময় একদিনে একটাও না হতে পারে।

কথা প্রসঙ্গে চন্দ্রমোহন জানালেন, গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে একটি চরকা ও তাঁত দিয়েছেন। ওই যন্ত্র দু'টি তাঁকে রোজগার বাড়াতে সাহায্য করেছে। একসময় রোজগার কম হওয়ায় কিছু মানুষ কাজ ছেড়ে দিয়েছিল। চন্দ্রমোহনের পরিবার কিন্তু তাঁতশিল্প থেকে লাভের মুখ দেখেছে। ধীরে ধীরে আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে তাঁরা দশ বিঘা জমির মালিক এবং চাষবাসেও তাঁরা সমানভাবে পারদর্শী। সুতোর বাজার মূলত কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ। কিছু কিছু সময়ে ভাল মানের সুতোর অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হয়।

*টাঙ্গাইল তাঁত*

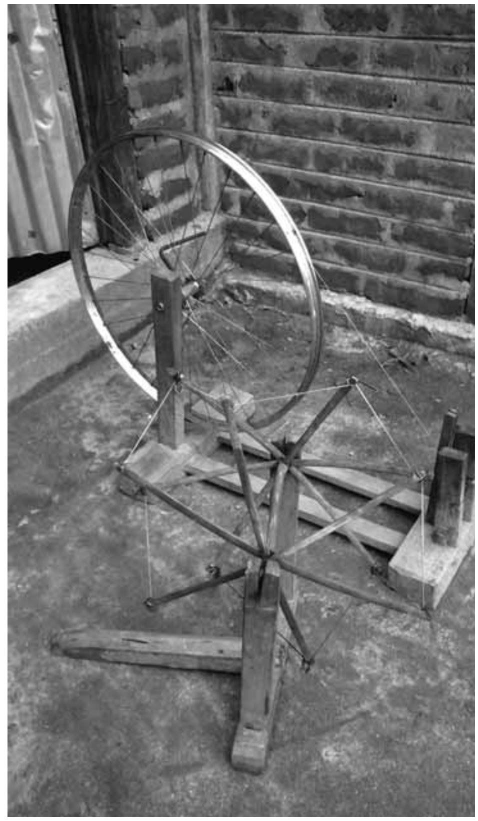
*চরকা ও চরকি*

আমাদের দেখে ব্রজগোপাল মণ্ডল এগিয়ে এলেন। তাঁতের কাজ জানেন, কিন্তু বর্তমানে চাষ-আবাদের কাজেই বেশি সময় ব্যয় করেন। তিনি বলছিলেন, এই এলাকায় চাষেরও ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। উচ্চফলনশীল বীজ, সঠিক মাত্রায় রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে ফলন বেড়েছে। নানারকম মরশুমি তরকারির আবাদ করে কৃষকরা আয় বাড়ানোর চেষ্টা করছে।

৩৫-৪০ বছর আগে কোচবিহার জেলার নিশিগঞ্জ এলাকাতে অনেক পরিবার তাঁতের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তন্তুবায় সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছিল, তারা কাঁচামাল সরবরাহ করত এবং বিপণনেও কিছুটা সাহায্য করত। সুধীররঞ্জন পাল, ম্যানেজার, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক নিশিগঞ্জ শাখার সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। ওই এলাকা সম্পর্কে এবং এলাকাবাসীর জীবিকা সম্পর্কে

তাঁতশিল্পের রমরমা বর্তমানে নেই। বহু শিল্পী এখানে তাঁতের কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। বেশ কিছু বড় বড় কারখানার শেড অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। মেশিনপত্রের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে।

তাঁর বিস্তারিত ধ্যানধারণা আছে। তিনি জানালেন, তাঁতশিল্পের রমরমা বর্তমানে নেই। বহু শিল্পী এখানে তাঁতের কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। বেশ কিছু বড় বড় কারখানার শেড অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। মেশিনপত্রের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। আরও জানলাম, একসময় ব্যাঙ্ক থেকে তাঁতশিল্পীদের ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। বেশ কিছু শিল্পী ঋণ পেয়েওছিলেন। পরবর্তীকালে কিছু পরিমাণ ঋণ অনুৎপাদক চরিত্র গ্রহণ করে। ব্যাঙ্ক নতুন ঋণ দিতে উৎসাহ হারায়। মালাকারবাবুর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে জানলাম, কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি, মানের অবনতি, প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার কারণে তাঁতশিল্পের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। দক্ষিণবঙ্গের শিল্পীদের সিন্থেটিক সুতোর ব্যবহার এবং দৃষ্টিনন্দন নকশার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অবশ্যই কঠিন।

ফালাকাটা ব্লকের গুয়াবার নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বড়ডোবা গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই তাঁতের কাজ হত। প্রায় ৮৭টি পরিবার এই কাজে যুক্ত ছিল। তা ছাড়া এলাকার বেশ কিছু যুবক নবদ্বীপে বিভিন্ন তাঁতের কারখানায় কাজ করে। এলাকার বাসিন্দা সরোজকুমার সরকার জানালেন, এলাকার উৎপাদিত সামগ্রী অনেকে নবদ্বীপে নিয়ে গিয়ে বিপণন ও বিক্রির ব্যবস্থা করে। তা ছাড়া ওখান থেকে সুতো, রং ইত্যাদিও আমদানি করে থাকে। তাঁর মনে হয়, কিছুটা অ্যাডভান্স প্রশিক্ষণ দিয়ে নকশার উন্নতি ঘটিয়ে শিল্পীদের সাহায্য করা দরকার। সঠিক মানের সুতোর ব্যবস্থা ও বিপণনের বন্দোবস্ত প্রয়োজন। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কাজগুলো করা সম্ভব হলে অনেক বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হতে পারে। তা ছাড়া যাঁরা বাড়িঘর, সন্তানদের ছেড়ে কয়েকশো কিলোমিটার দূরে জীবিকার জন্য আস্তানা গেড়েছেন— তাঁরা বাড়িতেই কাজের ক্ষেত্র খুঁজে পাবেন। আসলে উত্তরবঙ্গে তাঁতশিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য একটা মাস্টার প্ল্যান করা দরকার— এবং শিল্পীদের মতামত গ্রহণ করেই সেটা কার্যকরী করতে হবে।

# ডুয়ার্স থেকে দিল্লি

দেবপ্রসাদ রায়

বাঁশের চেয়েও কঞ্চি দড়? ডিম আগে, না মুরগি আগে? স্টুডিয়োপাড়ার ফ্লোরে 'অ্যাকশন' এবং 'কাট' বলবার অধিকার একমাত্র ডিরেক্টর সাহেবের। কিন্তু ক্যামেরা রোল হওয়ার নেপথ্যে হাজারটা ঝুটঝামেলা ম্যানেজের আসল জাদুকর হলেন হিসেবি প্রধান সহপরিচালকমশাই। কখনও কখনও ডিরেক্টর হয়ে যান রাষ্ট্রপতি আর চিফ এডি প্রধানমন্ত্রী! অর্থাৎ দরকার পড়লে অনভিজ্ঞ ডিরেক্টরকে তিনি অনায়াসে 'স্পিকটি নট' করে সাইডলাইনে বসিয়ে দিতে পারেন। সেই সংঘাতে সৃষ্ট মান-অভিমানের বিচিত্র পালাগান আস্বাদ করুন এই পর্বে!

।।৩৬।।

যদিও তৃতীয় শিবির হওয়ার পর প্রশিক্ষণার্থী পাঠাবার প্রশ্নে আর কোনও রাজ্য বাকি ছিল না, কিন্তু যেহেতু প্রথম শিবির যখন হয়, তখন যুব কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্বগুলি বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে না নেওয়ার কারণে রাজ্যগুলির অনেক জেলা প্রতিনিধিত্বহীন থেকে যায়। প্রশিক্ষণ দেওয়ার পিছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল, শেষ পর্যায়ে একটা এমন সময় আসবে, যখন কোনও জেলা যুব কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রশিক্ষণহীন থাকবে না। তাই মাইক্রো লেভেলে প্রতিটি জেলার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা জরুরি ছিল। ফলে আর-একটি ক্যাম্প উত্তর ভারতের রাজ্যগুলির সেই জেলাগুলি থেকে আগত ছেলেদের নিয়ে সংগঠিত করতে হল, যে জেলাগুলি আগে ছেলে পাঠায়নি।

এবারের সমস্যা অন্যরকম। প্রথম ব্যাচের ছেলেরা ছিল নরম মাটি, যারা শিবিরে আসবার আগে কোনও স্বপ্ন দেখেনি। তাদের দিয়ে কোনও গঠনমূলক কাজ হতে পারে— এ বিশ্বাস তাদের ভিতর জন্মাবার কোনও অবকাশ কখনও হয়নি। তাই তাদের অনুপ্রাণিত করা সহজ ছিল। দলের সৈনিকের মর্যাদা পাবে তা-ও তাদের স্বপ্নের অতীত ছিল। তাই যখন তাদের ভেঙেচুরে একটা নির্দিষ্ট দায়িত্বের জন্য তৈরি করা হয়েছে, তারা 'সাড়া' দিয়েছে অন্তর থেকে।

এবার যারা এল, তারা জেনেই এসেছে, এটা রাজীবজির নিজস্ব কর্মসূচি। এতে স্থান পেলে রাজীবজির নজরে আসা সহজ হবে। উচ্চাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যাই বেশি। আর স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, মালতী বোলার যে নিষ্ঠা নিয়ে ছেলেদের তৈরি করতেন, প্রফেসর ঠাকুরের ভিতর সে আগ্রহ বা দক্ষতা ছিল না। আর আমার চাপ ক্রমশ বাড়ছিল। কারণ ট্রেনিং নিয়ে ছেলেরা তো বাড়ি যাচ্ছে না। একটা 'ফিল্ড অ্যাসাইনমেন্ট' নিয়ে যাচ্ছে অন্য রাজ্যে। সেখানে শুরুতে নিজে জায়গা খুঁজে, জেলায় গোষ্ঠী রাজনীতির শিকার না হয়ে, ৩০ জন ছেলে জোগাড় করে তাদের ক্যাম্প করা ও তাদের নিয়ে 'ক্লাস্টারে' কাজ শুরু করা অত সহজ কাজ ছিল না। বহু জায়গা থেকেই ছেলেরা জানাত, তারা কোনও সহযোগিতা পাচ্ছে না। একটা শিবির চালাতে চালাতে সেটাও দেখতে হত। আমি তো তালকাটোরা স্টেডিয়ামেই থাকতাম। রাত ২টো পর্যন্ত কাজ করতে হত, কারণ ১০টা পর্যন্ত ক্যাম্পের কাজ দেখে, সে দিনের মতো সব কাজ শেষ হলে ফিল্ডের কাজ নিয়ে বসতাম। কারণ, শুরুতে তারা একটা ফ্যামিলিরাইজেশনের রিপোর্ট পাঠাত। সেটা পড়া আবশ্যিক ছিল, কারণ তা না হলে ওরা কী পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে, সেটা জানা সহজ ছিল না। আসলে গোটা কর্মসূচিটাই ভাবা হয়েছিল কতকগুলি সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে। কিন্তু বাস্তবে তা সবসময় সঠিক প্রমাণিত হয়নি। যেমন, আমরা শিবিরে বলতাম, দল সাহায্য করবে, কিন্তু লোকাল ব্যুরোক্রেসি সহযোগিতা না-ও করতে পারে, এমনকি তার জন্য একটা ক্লাসও নেওয়া হত 'কনসেপ্ট অফ কো-অপারেশন অ্যান্ড কনফ্লিক্ট', অর্থাৎ কো-অপারেশন না পেলে কনফ্লিক্ট-এ যেতে হবে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, কো-অপারেশন আধিকারিকরা দিতে কুণ্ঠা দেখায়নি, কিন্তু দলের অসহযোগিতার জন্য স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে ছেলেরা কনফ্লিক্ট-এ জড়িয়ে পড়েছে। সেন্ট্রাল মনিটরিং টিম ছিল। তারা প্রবলেম

রিজল্‌ভ করার চেষ্টাও করত। কিন্তু দলের নেতাদের মনে হত, এরা সব আমাদের হাঁড়ির খবর জেনে ফেলেছে— পরে উপরে সব জানিয়ে দেবে এবং তার ফল ভুগতে হবে।

ক্রমশ '৮৩ সালটা শেষ হয়ে এল। কিন্তু আমার শিবির শেষ হল না। তালকাটোরায় বসে শুনেছি, কলকাতায় এআইসিসি অধিবেশন হবে। কিন্তু আমার যাবার সুযোগ নেই। কারণ আমার ক্যাম্প চলছে। তবে ক্যাম্প চলছিল বলেই আমার ঘন ঘন রাজীবজি, অরুণ নেহেরু, অরুণ সিংদের সঙ্গে দেখা হবার অবকাশ হত। দলে অনেক ভিতরের কথা আমার সামনেই আলোচনা হত বলে আমি জানতে পারতাম। এরকমভাবেই একদিন শুনলাম যে, প্রচার উপসমিতির সভাপতি হিসেবে প্রিয়দা ইন্দিরাজির ছবি ব্যবহার করছে, কিন্তু রাজীবজির কোনও ছবি বা নাম কোথাও ব্যবহৃত হচ্ছে না। আমি প্রমাদ গুনলাম। সবে দলে ফিরেছে, আসবার সুযোগ পেয়েছে— এখন যদি এই অভিযোগ ওঠে, তাহলে তার খুব ভারী মূল্য দিতে হবে। তখন মোবাইলের যুগ নয়। প্রিয়দার কলকাতার টাকি হাউসের ফ্ল্যাটে ল্যান্ড ফোনে কল করলাম, 'নো রিপ্লাই' হল। তখন সুদীপকে ওর বাড়ির ফোনে পেয়ে বললাম, 'এখুনি সংশোধন করতে বলো, পরে আর সময় পাবে না।' তার খানিক পরে আমার ক্যাম্পের নাম্বারে প্রিয়দার ফোন এল। অভিযোগটা শুনে বললেন, 'আমি এভাবে ভাবিইনি। তুই জানিয়ে খুব ভাল করলি। আমি আজই ৫০ হাজার পোস্টার শুধু রাজীবজির ছবি দিয়ে ছেপে সারা রাজ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছি।' আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। একটা গুরুদক্ষিণা দেওয়া গেল। আরও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, চতুর্থ শিবিরটা শেষ হল বলে। কারণ দ্বৈত চাপে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল। এখন কেবল ফিল্ড। তাকে সামলাতে এত পরিশ্রম করতে হবে না।

এই শিবিরের দায়িত্ব ছাড়াও বিদেশ দপ্তরের দায়িত্বটা ছিলই। অনিল মাথরানী কো-অর্ডিনেটর ছিল বলে আমার কোনও অসুবিধা হয়নি। তাই শিবিরের চাপ কমতেই বিদেশ দপ্তরের কাজটায় রুচি নিতে শুরু করলাম। একটা ট্রিপ ছিল ইরাকের। কে যাবে, কে যাবে না, আমি সে বিতর্কে না গিয়ে সবটা তারিকের উপর ছেড়ে দিয়ে বললাম, আমার একজন ক্যান্ডিডেট আছে। তাকে এই দলে পাঠাতে হবে। 'হ্যাঁ' হতেই আমি কলকাতা থেকে তাপস রায়কে ডেকে এনে ইরাকের ট্রিপে জুড়ে দিলাম।

আমাদের অনমনীয় মনোভাবে শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছিল, বিশ্ব যুব উৎসব রাশিয়াতেই হবে। তার প্রস্তুতি কমিটির মিটিং হবে কিউবাতে। আমি প্রথম থেকে যুক্ত ছিলাম বলে যুব কংগ্রেস থেকে যে 'টু-মেম্বার' ডেলিগেশন যাবে বলে ঠিক হল, তাতে আমি ও বিহারের তদানীন্তন যুব সভাপতি শ্যামসুন্দর সিং ধীরাজকে পাঠানো হল। সিপিআই-এর যুব শাখা থেকে কুনালন বলে একজন তামিলনাড়ুর ছেলে ও সিপিএম-এর যুব শাখা থেকে সীতারাম ইয়েচুরি— সব মিলিয়ে এই চারজন কিউবার রাজধানী হাভানা রওয়ানা দিলাম। সব মিলিয়ে ২২ ঘণ্টার ফ্লাইট। মাঝে দুটো স্টপ ওভার। একটা মস্কোতে আর একটা আয়ারল্যান্ডের আইল্যান্ড শানন-এ। দিল্লি থেকে এয়ারোফ্লোটের বিমানে মস্কো। তারপর ওদেরই চার্টার্ড ফ্লাইট এসইউ৬২-তে মস্কো থেকে শানন হয়ে হাভানা। পুরো আটলান্টিকটা পেরিয়ে যেতে হয়।

একটা মজার ব্যাপার দেখলাম। মস্কো থেকে শুধু রাশিয়ার প্রতিনিধিরাই উঠল না। আফগানিস্তান, চাদ, ইরান, তুরস্ক প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ, যেখানে কম্যুনিস্ট পার্টি করা যাবে না, সেসব দেশের বা কম্যুনিস্ট পার্টির ছেলেরা মস্কোতেই থাকছে আর আন্তর্জাতিক আঙিনায় যে যার নিজের দেশের নামে প্রতিনিধিত্ব করছে। আমার পাশে যে লোকটি বসেছিল, সে নিজেকে বাহেরিনের বলে পরিচয় দিয়ে খোলসা করে জানাল, সে বহুদিন মস্কোতে আছে। কারণ দেশে যাওয়ার কোনও উপায় নেই। বিনে পয়সায় প্লেনে ভদকা পেয়ে এমন গলাধঃকরণ করতে শুরু করল যে, মাঝ আকাশে আমার সিটে হড়হড় করে বমি করে দিল। আমার তখন এক অসহনীয় অবস্থা। না নিজের সিটে বসতে পারছি, না কোনও সিট খালি আছে। যে যখন টয়লেটে যাচ্ছে, আমি তার সিটে বসে পড়ছি, আর সে এলে উঠতে হচ্ছে। যেহেতু বছর দুয়েক আগে রাশিয়া ঘুরে গিয়েছিলাম, 'কমসোমলের' চীফ আকসুয়োনভ আমায় চিনত। ও যখন শুনল আমার দুর্ভাগ্যের কথা, তখন বলল যে, তুমি আমার সিটে বোসো। আমি ককপিটে চলে যাচ্ছি, পাইলট আমার বন্ধু। আমার কোনও অসুবিধা হবে না। তারপর বাকি রাস্তাটা নিরাপদেই যাওয়া গেল।

সে সময়টা বিশ্বের সামনে সবচেয়ে বড় ইস্যু নিরস্ত্রীকরণ (disarmament), তাই আলোচনার থিমও তা-ই। আমি বিষয়টার উপর মোটামুটি তৈরি হয়ে গিয়েছিলাম। তাই যখন প্লেনারিতে বলার সুযোগ এল, তখন এত ফাস্ট বলেছিলাম যে, ট্রান্সলেটরদের 'পিজন হোল' থেকে বারবার লাইট জ্বলছিল, 'টক সফ্‌টলি'। বক্তৃতাটা মোটমুটি একটা দাগ কাটতে পারার ফলে 'ইন্ডিয়ান ডেলিগেশন'-এর গুরুত্ব বেড়ে গেল। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বিনোদ খান্না ভারতীয়

প্রিয় রঞ্জন দাসমুন্সি

প্রিয়দা বললেন, 'আমি এভাবে ভাবিইনি। তুই জানিয়ে খুব ভাল করলি। আমি আজই ৫০ হাজার পোস্টার শুধু রাজীবজির ছবি দিয়ে ছেপে সারা রাজ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছি।' আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। একটা গুরুদক্ষিণা দেওয়া গেল।

দূতাবাসে ইন্ডিয়ান ডেলিগেশনের অনারে নৈশভোজের ব্যবস্থা করলেন। যে দিন রাতে ভোজের ব্যবস্থা, আমরা সবাই সেখানে পৌঁছে নৈশভোজের আগে নিজেদের ভিতর গল্পগুজব করছি, হঠাৎ খবর এল, রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান আন্দ্রেপভ মারা গিয়েছেন। উনি ব্রেজনেভের মৃত্যুর পর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আকস্মিক খবরে পুরো হলে নিস্তব্ধতা। সেই মৌনতাকে নস্যাৎ করে দিয়ে আমার সফরসঙ্গী শ্যামসুন্দর সিং ধীরাজ বলে উঠল, 'মরবেই করেগা। নব্বই সালকা বুড্ডাকো বানায়গা তো জরুর মরেগা, অব জিসকো বনায়া, ও ভী মরেগা।'

ভোজসভাটা শোকসভায় পরিণত হয়েই গিয়েছিল, ধীরাজের এই 'সোচ্চার' শোকবার্তায় সবাই হকচকিয়ে গেলেন। কেউ আর কোনও কথা না বাড়িয়ে নীরবে ভোজন সেরে হোটেলে ফিরে গেলেন। আর ধীরাজের ভবিষ্যৎ বাণী সফল করে চেরেনেঙ্কো, যিনি আন্দ্রেপভের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন, অল্প কিছুদিনের ভিতর তিনিও শেষের খেয়ায় চেপে বসলেন। গরবাচভ এলেন।

*(ক্রমশ)*

*জরাজীর্ণ গ্যারগান্ডা ফ্যাক্টরি*

# ডানকান চা সাম্রাজ্যের সংকট মালিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি! সমাধানের পথ তাই আজ দূর অস্ত?

ডুয়ার্সের সাতটি বাগান পুরোদস্তুর চালু থাকলে বছরে এক কোটি কেজি চা উৎপাদন করার ক্ষমতা আছে ডানকানদের। অথচ সেই বাগানগুলিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী করে সারা পৃথিবী আঙুল তুলছে মালিক গোষ্ঠীর দিকেই। আজ বাগান চালানোর জন্য দক্ষ শ্রমিকের অভাব, বেশির ভাগই জীবিকার স্বার্থে পাড়ি দিয়েছে ভিনরাজ্যে। পুনরুজ্জীবন প্যাকেজ থাকলেও ইতরবিশেষ ঘটেনি, ক্রমশই শ্রমিকের বকেয়ার পাহাড় জমেছে, সেই সঙ্গে ঘন ঘন মিলছে শ্রমিকের মৃত্যুর খবর। বাগানের এই রুগ্ন অবস্থার জন্য বিআইএফআর যেখানে স্পষ্ট দায়ী করেছে ম্যানেজমেন্টকে, সেখানে প্রশ্ন জাগে, সত্যিই কি বাগানগুলিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব? নাকি মালিক গোষ্ঠীই তা চাইছেন না? ডানকানদের চা-কাহিনি শুনিয়েছেন **ভীষ্মলোচন শর্মা** তাঁর ২০তম পর্বে।

চায়ের ডুয়ার্স ডুয়ার্সের চা

১৮৫৯ সালে স্কটিশ ব্যবসায়ী প্লেফেয়ার ডানকান চা-ব্যবসার জন্য ডানকান অ্যান্ড কোম্পানির পত্তন করেন। বিদেশের বাজারে উৎকৃষ্ট চা রপ্তানি করার ক্ষেত্রে কোম্পানি সুনাম অর্জন করার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই ডানকান'স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড চা-শিল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুখ্যাতি লাভ করে। চা ব্যবসাতে সাফল্য আসার ফলে কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে অ্যাংলো ইন্ডিয়া জুট মিল। পাটশিল্পেও কোম্পানি অর্থ বিনিয়োগ করে। ব্যবসার পরিধি বাড়ার ফলে কোম্পানির নাম বদলে হয় ডানকান'স ব্রাদারস লিমিটেড বা বিডিএল। এই সময় কোম্পানির ছিল দু'টি পৃথক ব্যবসা— চা এবং পাট। দু'টি পৃথক ব্যবসা দেখাশোনা করবার জন্য দু'জন পৃথক বোর্ড অব ডিরেক্টরস ছিলেন। চা ব্যবসার সুবিধার্থে ডানকান ব্রাদারস লিমিটেড বীরপাড়া টি কোং নামে পৃথক একটি কোম্পানি খোলে। উনিশ শতকের শেষ দিকে চা-শিল্পের রমরমা বৃদ্ধি পেতে থাকলে মূলধনের চাহিদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। প্রবেশ করে দেশীয় সুদের কারবারি হিসাবে ধনী মাড়োয়ারি বেনিয়ারা। চা কোম্পানিগুলি তাদের থেকে প্রচুর পরিমাণ টাকা

*কাজে ফাঁকি ধুমচিপাড়াতে*

ঋণ নিতে শুরু করে। স্বাধীনতার পরে বিদেশি চা-করেরা ভারত ছাড়তে শুরু করেন। বিদেশে ফিরে যাওয়া মালিকদের বদলে দেশীয় ঋণদাতা শ্রেণির প্রবেশ ঘটল চা-বাগান মালিকানায়। এইভাবেই ১৯৫৯ সালে গোয়েঙ্কা পরিবারের প্রাণপুরুষ কেশবপ্রসাদ গোয়েঙ্কা ডানকান ব্রাদারস লিমিটেড কিনে নিলেন। অ্যাংলো ইন্ডিয়া জুট মিল এবং বীরপাড়া টি কোং অধিগ্রহণের ফলে গোয়েঙ্কা পরিবার 'ডানকান গোয়েঙ্কা' নামে পরিচিত হলেন। গোয়েঙ্কা পরিবারের পূর্বপুরুষরা ছিলেন ধনী মহাজন এবং তাঁরা ব্রিটিশ জমানাতে কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। তাঁদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড ঋণ দেওয়া আর টাকা খাটানোর মধ্যে দিয়ে চটজলদি মুনাফা অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শিল্প উদ্যোগে দক্ষতা অর্জন আয়ত্ত করার ব্যাপারে তাঁদের কোনও উৎসাহ ছিল না। ১৯৭৯ সালে গোয়েঙ্কা পরিবারে ফাটল ধরলে ডানকান ব্রাদারস লিমিটেড-এর মালিকানা পান জিপি গোয়েঙ্কা এবং তিনি কোম্পানির চেয়ারম্যানও হন। ইতিমধ্যে ১৯৭৭ সালে ডানকান অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বা 'ডেইল' নামকরণ হয়ে বীরপাড়া টি কোম্পানির নতুন রূপান্তর ঘটে। ১৯৯৩ সালে ডানকান'স গ্রুপ সার প্রস্তুতির পথে পা বাড়ায়। ওই একই বছরে জিপি গোয়েঙ্কা ডানকান'স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বা 'ডিল' গড়ে তোলেন, ডানকান'স অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর অবলুপ্তি ঘটে। চা-বাগান আর ফ্যাক্টরিগুলিকে ডানকান'স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর ছত্রছায়ায় নিয়ে আসা হয়। সার প্রস্তুত কারখানাসহ ডানকানের অন্য কোম্পানিগুলিও, যেগুলি রিয়্যাল এস্টেট, ফাটকাবাজার, বিভিন্ন প্রকার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল, সেগুলিকে ১৯৯৯ সালে ডানকান'স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর সঙ্গে যুক্ত করে পথচলা শুরু হয়। সব ক'টি ব্যবসাই একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং একই কোম্পানির তত্ত্বাবধানে চলতে থাকল।

ডানকান'স গোষ্ঠীর বাগানগুলির বর্তমান অবস্থা সরেজমিনে খতিয়ে দেখার জন্য বীরপাড়া থেকে বার হলাম। বাগানে শ্রমিকের হাতে ম্যানেজার 'খুন' হবার পর প্রায় দু'মাস বন্ধ ছিল ডুয়ার্সের দলমোর চা-বাগান। বাগানে প্রায় দুই হাজার শ্রমিক। ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে বাগান খোলার সিদ্ধান্ত হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, উত্তরবঙ্গ হবে সুইটজারল্যান্ড। কিন্তু বন্ধ চা-বাগিচার উত্তরবঙ্গ এখন অনাহার মৃত্যুর উপত্যকা, তার মধ্যে অধিকাংশই ডানকানসের বাগান। যে কয় মাস বন্ধ ছিল, অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায়নি এই চা-বাগিচা। ১৫ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শ্রমিকদের অভিযোগ, অপুষ্টি এবং অনাহারে এই মৃত্যু। অন্য দিকে সরকার বা স্বাস্থ্যমন্ত্রকের বক্তব্য, অসুস্থতাজনিত কারণেই এই মৃত্যু। প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট না মেনেই বাগান চালাচ্ছেন বাগান কর্তৃপক্ষ। বহু বাগানে আইন অনুসারে প্রাপ্য রেশন নিয়মিত দেওয়া হয় না। চা-বাগিচার শ্রমিক লাইনের বাসিন্দাদের অর্ধাহার, পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার চরম অবনতি ঘটছে। চা শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে বকেয়া টাকার পরিমাণ বেড়েই চলেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, উত্তরবঙ্গ হবে সুইটজারল্যান্ড। কিন্তু বন্ধ চা-বাগিচার উত্তরবঙ্গ এখন অনাহার মৃত্যুর উপত্যকা, তার মধ্যে অধিকাংশই ডানকানসের বাগান। যে কয় মাস বন্ধ ছিল, অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায়নি এই চা-বাগিচা। ১৫ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শ্রমিকদের অভিযোগ, অপুষ্টি এবং অনাহারে এই মৃত্যু।

দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকার ফলে ফের চালু হয়েছে ডানকানের হান্টাপাড়া ও ধুমচিপাড়া চা-বাগান। ডানকানের অভিযোগ বাগান খোলার আগে রাজ্য সরকার সার্বিক সহায়তার আশ্বাস দিলেও, প্রতি পদে বাধা সৃষ্টি করছে বিদ্যুৎবণ্টন নিগম। রুগ্‌ণ সংস্থাটির বোঝা লাঘবের জন্য শ্রমিক আবাসগুলিতে ডোমেস্টিক বিদ্যুৎ সংযোগের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। ডানকান দ্বিচারিতার অভিযোগ এনে প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়েছে, বিদ্যুৎবণ্টন নিগম যদি অসহযোগিতার পথে চলতে থাকে, তবে ডানকানের পক্ষে বাগানগুলি সুস্থভাবে চালানো অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং বিঘ্নিত হবে শ্রমিক-স্বার্থ। বাগান বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া তাদের আর অন্য কোনও উপায় থাকবে না। ডানকানের জেনারেল ম্যানেজার দেব সেন বিদ্যুৎবণ্টন নিগমের বীরপাড়ার স্টেশন ম্যানেজারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। স্টেশন ম্যানেজার হাসিবুর রহমানকে দূরভাষে ধরার চেষ্টা করা হলে তাঁকে পাওয়া যায়নি। অন্য দিকে ডানকানসের পক্ষে বীরপাড়া চা-বাগানের সিনিয়র ম্যানেজার ঋষি মলহোত্রা জানিয়েছেন, 'বীরপাড়া চা-বলয়ের আরও অনেক বাগানের মধ্যে বেছে বেছে কেন ডানকানসের বাগানগুলিকেই টার্গেট করা হচ্ছে তা বুঝতে পারছি না। ইতিমধ্যেই ধাপে ধাপে বকেয়া অর্থ মেটানো শুরু হয়েছে। খানিকটা সময় তো লাগবেই।' পাশাপাশি বিদ্যুৎবণ্টন নিগমের বিরুদ্ধে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি মোহন শর্মা অতি সক্রিয়তার অভিযোগ এনে জানিয়েছেন, পরিস্থিতি যদি বাগান বন্ধের দিকে যায় তাহলে সমস্ত দায়টাই বর্তাবে বিদ্যুৎবণ্টন নিগমের উপরই। অন্য দিকে, বিদ্যুৎ মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় পরিষ্কারভাবেই জানিয়েছেন, কোনও সংস্থার কাছে টাকা পাওনা থাকলে সংশ্লিষ্ট এলাকার আধিকারিকরা বকেয়া না মেটালে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা তো নেবেই। এই চাপানউতোরের মধ্যে দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে হান্টাপাড়া ও ধুমচিপাড়া।

ডানকান গোষ্ঠীর সাতটি সংকটজনক বাগানকে চিহ্নিত করে সেই বাগানের দায়িত্ব নতুন কোনও সংস্থার হাতে তুলে দিতে টি বোর্ডকে দায়িত্ব দিয়েছিল কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রক। ডিমডিমা বাগানটি বিআইএফআর-এর আওতার বাইরে থাকায় সেটার জন্যই আগ্রহপত্র চেয়েছিল বোর্ড। পরবর্তীতে বীরপাড়া, গ্যারাগান্ডা,

লংকাপাড়া, তুলসীপাড়া, হান্টাপাড়া, ধুমচিপাড়ার জন্য আলাদা আলাদাভাবে আর্থিকসহ কিছু শর্ত চাপিয়ে সংশোধিত আগ্রহপত্র চেয়ে টি বোর্ড বিজ্ঞপ্তি প্রদান করলে কয়েকটি সংস্থা আগ্রহপত্র জমা দেয় এবং কয়েকটি সংস্থা একাধিক বাগান পরিচালনার ভার নিতেও আগ্রহ দেখায়। বিভিন্ন শর্তের ভিত্তিতে আগ্রহপত্রের মূল্যায়ন করে, সেই প্রক্রিয়ায় কেউ যোগ্য বলে বিবেচিত হলে তবেই তাদের চূড়ান্ত পর্বের জন্য বাছাই করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ডিমডিমার জন্য আগ্রহপত্রে যোগ্য হিসাবে কাউকে নির্বাচন করতে পারেনি বোর্ড। ডানকান গোষ্ঠীর বাকি বাগানগুলির ভবিষ্যৎও স্পষ্ট নয়। এই পরিস্থিতিতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে ডানকানসের বাগানগুলি। বীরপাড়া, গ্যারাগান্ডা, লংকাপাড়া, তুলসীপাড়া, হান্টাপাড়া এবং ধুমচিপাড়ার জন্য একগুচ্ছ দরপত্র ঝাড়াইবাছাই করে মূল্যায়নের পরে শুধুমাত্র বীরপাড়া ও গ্যারাগান্ডার জন্য চারটি সংস্থা প্রাথমিক যোগ্যতামান পেরয়। তাই উত্তরবঙ্গের সাতটি চা-বাগিচার সাড়ে সতেরো হাজার কর্মীর মুখে হাসি ফুটবে কি না— এই প্রশ্নের উত্তরে অনিশ্চয়চতার মেঘই ঘনীভূত। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানিয়েছিলেন, গৌরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কার মালিকানাধীন ডানকান লিমিটেড পরিচালিত চা-বাগানগুলির মধ্যে ৭টি বাগান কেন্দ্রীয় সরকার অধিগ্রহণ করেছে, কারণ ১৯৫৩ সালের ভারতীয় চা আইনের ধারাকে অমান্য করে ডানকানস যেভাবে বাগানগুলি চালাচ্ছিল তা শিল্পের জন্য যেমন ক্ষতিকর, বৃহত্তর সমাজের পক্ষেও তেমনই খারাপ। বাগানগুলির পরিচালনার মানের উন্নতির জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার সেগুলিকে অধিগ্রহণ করেছে।

ডানকানস গোষ্ঠীর অধিগৃহীত বাগানগুলির মোট কর্মীসংখ্যা ছিল ১৭৫৫৫। বীরপাড়া চা-বাগানে ৩৯৩৭, গ্যারাগান্ডায় ১৭৭৭, লংকাপাড়ায় ২৯১৯, তুলসীপাড়ায় ১৭৩৭, হান্টাপাড়ায় ২২৯৫, ধুমচিপাড়ায় ২৫৮৪ এবং ডিমডিমা চা-বাগিচায় ২৩০৫। যৎসামান্য মজুরির টাকা বহুদিন বকেয়া রাখা, স্বাস্থ্য, শিক্ষাখাতে কোনও পরিকাঠামো না থাকা, অনাহার, দারিদ্র, অশিক্ষায় জর্জরিত বাগানগুলিতে কার্যত দুঃস্বপ্নের কালরাত্রি নেমে এসেছিল। চা-বাগিচার শ্রমিক পরিবারে যখন অনাহারে, অপুষ্টিতে প্রায় ৭০ জন মারা গিয়েছে, তখন উদ্‌বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গৌরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কার সঙ্গে একাধিকবার আলোচনায় বসেন। উত্তরবঙ্গ সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশে চা-শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার আবেদন জানিয়েছিলেন, এবং তারই ফলশ্রুতিতে উত্তরবঙ্গ সফরে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং শেষ পর্যন্ত অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। হঠাৎ করেই অনিশ্চয়তা তৈরি করে ডানকানস জানায়, কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ডানকানস আইনি পথেই হাঁটবে।

কেন্দ্রের বিজ্ঞপ্তিকে কেন্দ্র করে হাই কোর্টের বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদলতে মামলা করে ডানকান গোষ্ঠী। ১৫ মার্চ সঞ্জীববাবু তাঁর রায়ে জানান, বৈধ কারণেই উত্তরবঙ্গে ডানকানের ৭টি চা-বাগান হস্তান্তর করতে চেয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল কেন্দ্র। এই রায়ের পরই বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে ফের মামলা করে ডানকান গোষ্ঠী। কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল কৌশিক চন্দ জানান, ডানকানের ১৪টি চা-বাগানের মধ্যে ৭টি হস্তান্তরের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রক যে বিজ্ঞপ্তি জারি করে, ডিভিশন বেঞ্চ সেই বিজ্ঞপ্তির উপরে কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি। টি বোর্ডের আইনজীবী তিলক বসু বলেন, শ্রমিকদের বকেয়া মেটানোর নির্দেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। সিঙ্গল বেঞ্চের পর কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুরের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি থাকলেও, আগ্রহী সংস্থার কাছ থেকে টি বোর্ডের দরপত্র চাওয়ার প্রক্রিয়া স্থগিত রাখেনি আদালত। তবে যোগ্য সংস্থা ছাড়া অন্য কারও হাতে বাগান তুলে দিলে ফের মুখ থুবড়ে পড়তে পারে বাগানের কাজকর্ম। বিশেষ করে বাগান পরিচালনার দৈনন্দিন খরচ মেটানোর মতো আর্থিক ক্ষমতা থাকা একান্তই আব্যশক নতুন পরিচালক সংস্থার, না হলে শ্রমিকদের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিয়তার মুখে পড়তে পারে। তাই ভাবনাচিন্তা করেই আগ্রহী সংস্থা খোঁজার পরামর্শ টি বোর্ডকে দেয় আদালত।

ডানকানসের লংকাপাড়া চা-বাগান যাবার অপরিত্যক্ত রাস্তা

টি বোর্ড সংশোধিত আগ্রহপত্রে সম্ভাব্য ক্রেতাদের আর্থিকসহ কিছু শর্ত প্রদান করেছিল। তাঁদের ন্যূনতম ব্যবসার পরিমাণ, কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ এবং বাগান পরিচালনার জন্য ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি দেওয়ার অঙ্ক নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। ঠিকমতো বাগান পরিচালনা করতে না পারলে যাবতীয় সুযোগসুবিধা প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা বলা ছিল। চা-শিল্পের অভিযোগ, বাগান পরিচালনা হস্তান্তরের শর্তাবলি ব্যবসায়িকভাবে যথেষ্ট আকর্ষণীয় নয় বলে সেভাবে কেউ আগ্রহী হচ্ছে না। এইরূপ আলোচনা চলার মাঝেই শ্রমিকদের বকেয়া মেটাতে হবে— এই শর্তে উত্তরবঙ্গে সাতটি চা-বাগান চালানোর জন্য ডানকান গোষ্ঠীকে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেয় কলকাতা হাই কোর্ট। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি গিরীশ গুপ্ত এবং বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ তাদের শর্ত দেয়— (১) বাগান পরিচালনা পদ্ধতি বিষয়ে প্রতি ১৫ দিন অন্তর টি বোর্ডকে রিপোর্ট দিতে হবে ডানকান গোষ্ঠীকে। (২) চা-বাগিচার যন্ত্রপাতি তারা সরাতে পারবে না। ডানকানের আইনজীবী অনিন্দ্য মিত্র জানান, কেন্দ্রের অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে যে মামলা হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতেই হাই কোর্ট অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়েছে।

উত্তরবঙ্গে ডানকান-সহ বিভিন্ন চা-বাগিচায় বহু শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অনাহারে শ্রমিকদের মৃত্যুর অভিযোগ উঠলেও বাগান মালিকরা তা মানতে নারাজ। রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হলে কেন্দ্র ডানকানস গোষ্ঠীর সাতটি বাগানের পরিচালনভার অধিগ্রহণ করে এবং পরে অন্য সংস্থাকে তা হস্তান্তরের জন্য দায়িত্ব দেয় টি বোর্ডকে।

ডিমডিমা ছাড়া ডানকান গোষ্ঠীর বাকি ছয়টি বাগানই বিআইএফআরে ছিল।

প্রাথমিকভাবে দু'টি বাগান ছাড়া বাকিগুলির জন্য কোনও যোগ্য সংস্থাই এখনও মেলেনি। সব মিলিয়ে ডানকান গোষ্ঠীর বাগানগুলির সংকট কবে কাটবে তা নিয়ে সংশয় কমছে না। যদিও ডানকান গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান জিপি গোয়েঙ্কা বাগান পরিচালনার বিষয়ে সেখানকার বাস্তব পরিস্থিতি বুঝতে কর্মী, ইউনিয়ন এবং প্রশাসনের সঙ্গে বসেছিলেন। বন্ধ বাগান নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেন এবং অতিদ্রুত বাগান স্বাভাবিক করার নির্দেশ দেন। ডানকান কর্তার দাবি, সাতটি বাগানে শ্রমিকদের বকেয়া ৬০ কোটি টাকা তাঁরা ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা করে চুক্তি করবেন। যেহেতু বাগানগুলিতে ম্যানেজার নেই, তাই নতুন ম্যানেজার নিয়োগ করা হবে বলেও জানান ডানকান কর্তা। আলিপুরদুয়ারে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে এক বৈঠকে তাঁদের বিস্তারিত পরিকল্পনা ঘোষণা করেন ডানকানস কর্তৃপক্ষ। জেলাশাসকের দপ্তরের বৈঠকে প্রশাসনিক কর্তাদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি মোহন শর্মা এবং ডানকানস গোষ্ঠীর পক্ষে ছিলেন সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেকে শাহ এবং উপদেষ্টা কেকে মেহরা।

আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক দেবীপ্রসাদ করনম জানিয়েছেন, ডানকান গোষ্ঠী বাগান খোলার পর থেকেই শ্রমিকদের পাওনা নিয়মিত মিটিয়ে যাবে। চা-বাগিচাগুলি বন্ধ থাকাকালীন যে পাহাড়প্রমাণ বকেয়া পড়ে রয়েছে মজুরি বাবদ, তা-ও কিস্তিতে শোধ করা হবে সদর্থক মনোভাব নিয়েই। গোটা দুনিয়ায় দার্জিলিং চায়ের কদর, উচ্চমানের চায়ের দামও আন্তর্জাতিক বাজারে যথেষ্ট। সাতটি বাগান পুরোদস্তুর চালু হলে বছরে এক কোটি কিলোগ্রাম চা উৎপাদন করার ক্ষমতা আছে ডানকানের। বলাই বাহুল্য, চা-বাগিচা অধিগ্রহণের সিদ্ধান্তটি যতটা বাণিজ্যিক বা অর্থনৈতিক, তার চেয়ে ঢের বেশি রাজনৈতিক। কিন্তু প্রশ্নটা উঠছে, লাভ কী হল? অভাবের কারণে বিকল্প রোজগারের ব্যবস্থা করতে শ্রমিকরা পাড়ি দিয়েছেন ভিন রাজ্যে। সেখানে চা-বাগিচার চেয়ে অনেক বেশি মজুরিতে শ্রমিকের কাজ করছেন তারা। ফলে চা-বাগান খোলার খবরে কোনও আগ্রহ নেই তাঁদের। তাই ডানকান গোষ্ঠীর বাগানগুলিতে শ্রমিকের ঘাটতি দেখা দেওয়ায় বাগিচাগুলিতে উৎপাদন মার খাবার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এবং নতুন করে সমস্যা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বীরপাড়ার শ্রমিকসংখ্যা ৩৪৪৯। ডানকান গোষ্ঠীর দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, প্রথম দিন ১৬৭৭ এবং তারপরে সব মিলেমিশে ২০০০ শ্রমিক কাজে যোগ দিয়েছেন। বীরপাড়ার মতো বড় গার্ডেনে স্বাভাবিক কারণেই উৎপাদন মার খাবে। বীরপাড়া বাগানে পুজো দিয়ে কাজ শুরু হলেও শ্রমিকরা পুজো বয়কট করেন বন্ধ থাকাকালীন বকেয়া নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত না হওয়ার ক্ষোভে। বীরপাড়ার শ্রমিক মঙ্গল বেক, রাজু লাকলারা তাই হতাশ। গুজরাতে কর্মরত রাজু লাকরা দূরভাষে জানালেন, 'এখানে রোজ ৬৫০ টাকা পারিশ্রমিক পাই। বাইরে না এলে জানতামই না, দুনিয়াটা কত এগিয়ে গিয়েছে। আর অন্ধকারে ফিরতে চাই না।' হান্টাপাড়ার শ্রমিক চেতু লোহার বলেন, 'বিশ্বাসটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এর আগেও বাগান খোলার পরেও আবার বাগান বন্ধ হয়েছে। আর ভরসা করি না।' তাই বলা যায়, বদলায়নি কিছুই। ডানকানের চা শ্রমিকদের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয়নি। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের তরফে শ্রমিক-স্বার্থে নানাবিধ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বাগানের অবস্থা খতিয়ে দেখতে এসেছেন রাজনৈতিক দলের নেতারা, কিন্তু অবস্থার উন্নতি হয়নি। চা-বাগিচা বন্ধ, থাবা বসিয়েছে অভাব, বাড়ছে মৃত্যু, বাঁচার পথ খুঁজে নিতে বাগিচার তরুণী-কিশোরীরা হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের পথে। প্রতিশ্রুতি অনেক, কিন্তু কার্যত কিছুই হচ্ছে না।

চা-বাগান সংগ্রাম সমিতির নেতৃত্বের সঙ্গে আলাপচারিতায় ডানকানসের বাগানগুলির পরিচালক হিসাবে গোয়েঙ্কাদের শোষণের অন্য রূপটি জানা গেল। ডানকান'স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর ব্যবসাতে অশান্তির সূত্রপাত হয় এই শতকের গোড়ায়, যখন বিভিন্ন অর্থনৈতিক জটিলতার কারণে সংস্থা তীব্র আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়। ধারাবাহিকভাবে কোম্পানির লোকসান হতে থাকে। দীর্ঘদিন ধরেই নগদ পুঁজির বেহাল অবস্থা তো ছিলই, পাশাপাশি ২০০৬ সালে রুগ্‌ণ শিল্প সংস্থা (বিশেষ সুবিধা) আইন ১৯৮৫ অনুযায়ী কোম্পানি বিআইএফআর অর্থাৎ বোর্ড ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ফিনানশিয়াল রিস্ট্রাকচারিং-এর দ্বারস্থ হয়। বিআইএফআর জানায়, কোম্পানির আর্থিক সমস্যা তিনটি কারণে— ১) ২০০২ সালের মার্চ মাসে ভারত সরকার ইউরিয়ার উপর ভরতুকি কমিয়ে দেবার ফলে সার কারখানাগুলি ক্রমাগত লোকসানের মুখে পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। ২) ভরতুকি বাবদ টাকা বন্ধ হওয়ায় এবং ন্যাপথার মূল্যবৃদ্ধির ফলে ইউরিয়ার প্রস্তুতিমূল্য দ্রুতহারে বাড়তে থাকে এবং সার কারখানাজনিত দেনার ফলে কোম্পানির ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে ঘাটতি আসে। ৩) চা-শিল্পে তখন মন্দার সময়কাল ছিল বলে কোম্পানিকে কর্পোরেট ঋণ পুনর্গঠন


ডানকানস গোয়েঙ্কারা হল পশ্চিমবঙ্গের চা-শিল্পের অন্যতম প্রধান স্টেকহোল্ডার। কোম্পানির টি প্ল্যান্টেশন ডিভিশনের মালিকানায় পনেরোটি বাগান আছে। উত্তরবঙ্গের তরাই, ডুয়ার্স আর দার্জিলিঙের প্রায় ৮০০০ হেক্টর আবাদি জমিকে কেন্দ্র করে ডানকানের চা সাম্রাজ্য।


প্রক্রিয়ার অধীনে নিয়ে আসার জন্য বিআইএফআর-এর হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়। লক্ষ্য, ব্যাঙ্ক-সহ বিভিন্ন ঋণদাতা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সুবিধা লাভ করা। ২০০৭-এর ৩১ মার্চ কোম্পানির আবেদন নিয়ে একটি শুনানি হয় এবং বিআইএফআর একে একটি রুগ্‌ণ শিল্পপ্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করে। বিআইএফআর এসবিআই ক্যাপিটাল মার্কেটকে দায়িত্ব দেয় কোম্পানির পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে। পুনরুজ্জীবন স্কিমটিতে বলা হয়, সারশিল্পটি ডিআইএল থেকে আলাদা করা এবং চা বিভাগ কোম্পানির হাতে রাখা। এই পুনরুজ্জীবন প্যাকেজও ডিআইএল-এর রুগ্‌ণ বাগানগুলির জন্য কোনও কার্যকর সমাধান এনে দিতে পারেনি। পুনরুজ্জীবন প্যাকেজ থাকা সত্ত্বেও কোম্পানির হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর বেতনসহ অন্যান্য বিধিবদ্ধ সুযোগসুবিধা বাবদ বকেয়া পাহাড়প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি, উদ্‌বেগজনকভাবে বেড়েছে অনাহারে মৃত্যুর খবর। এই উদ্‌বেগজনক পরিস্থিতিতেই কেন্দ্রীয় শিল্প এবং বাণিজ্যমন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি জারি করে ডানকান অধীনস্থ সাতটি চা-বাগান অধিগ্রহণের পরিচালনভার হাতে নেওয়ার জন্য টি বোর্ডকে নির্দেশ দেয়। নির্দেশে বলা হয়েছে, বাগিচাগুলি যেভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে, সেটা চা-শিল্প ও জনস্বার্থের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

ডানকানস গোয়েঙ্কারা হল পশ্চিমবঙ্গের চা-শিল্পের অন্যতম প্রধান স্টেকহোল্ডার। কোম্পানির টি প্ল্যান্টেশন ডিভিশনের মালিকানায় পনেরোটি বাগান আছে। উত্তরবঙ্গের তরাই, ডুয়ার্স আর দার্জিলিঙের প্রায় ৮০০০ হেক্টর আবাদি জমিকে কেন্দ্র করে ডানকানের চা সাম্রাজ্য। বছরে প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ কেজি মেড টি প্রস্তুত করতে সক্ষম এই সাম্রাজ্য। আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট ব্লকে সাতটি টি এস্টেট— হান্টাপাড়া, ধুমচিপাড়া, গ্যারাগান্ডা,

*ওপরে ডানকানসের দলমোর চা-বাগানের জরাজীর্ণ কারখানা, নিচে বাঁ দিক থেকে জরাজীর্ণ শ্রমিক আবাসন, ডানকানসের উপহার নদীর পাড়ে শিশু শ্রমিকদের অব্যক্ত জীবনযন্ত্রণা, অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকরা কী করবেন? নেই কাজ, নেই খাবার, নেই রেশন*

লংকাপাড়া, তুলসীপাড়া, ডিমডিমা এবং বীরপাড়া। জলপাইগুড়ির মালবাজার মহকুমায় তিনটি— বাগরাকোট, নাগেশ্বরী এবং কিলকট। দার্জিলিং জেলার তরাইতে গঙ্গারাম এবং পাহাড়ে রংলি— রংলিয়ট। অন্য তিনটি চা-বাগিচাতে প্রথাগতভাবে বীজ ব্যবহার করে প্ল্যান্টেশন হয়নি, চা গাছগুলি বেড়ে উঠেছে হাইব্রিড ক্লোনের সাহায্যে। ক্লোনাল বাগান তিনটির দু'টি হল উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া ব্লকের গোয়ালগছ ল্যান্ড প্রোজেক্ট ও ইসলামপুর ব্লকের পাটাগোড়া তরাই ল্যান্ড প্রোজেক্ট এবং অপরটি হল আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট ব্লকে অবস্থিত মাদারিহাট ল্যান্ড প্রোজেক্ট। উত্তর দিনাজপুরের বাগান দু'টি থেকে উৎপন্ন চা-পাতা প্রসেসিং-এর জন্য ডানকান গোয়েঙ্কা বার্ষিক ১৮০০ টন উৎপাদনে সক্ষম একটি কারখানা করেছে। গত শতাব্দীর নয়ের দশকে সাধারণভাবে তরাই ও ডুয়ার্সে গড় বার্ষিক যতটা কাঁচা পাতা উত্তোলন হত, ডানকানসের বাগানগুলিতে উৎপাদনশীলতার হার তার চেয়ে অনেকটাই বেশি ছিল।

ডানকান'স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর বাগানগুলি রুগ্‌ণ হিসাবে বিআইএফআর-এর তালিকাভুক্ত। চা-বলয়ের শ্রমিক-কর্মচারী এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির সন্দেহ ছিল যে, দীর্ঘকালীন আর্থিক দুর্নীতির কারণেই এই রুগ্‌ণতা। তাদের আশঙ্কা ছিল, কোম্পানি চা-বাগানগুলি থেকে প্রাপ্ত মুনাফার অর্থ এক বা একাধিক অন্য ব্যবসাতে লাগিয়েছে, যেখানে আর্থিক ভরাডুবি হয়েছে এবং তার ফল ভুগছেন চা-বাগানের শ্রমিক-কর্মচারীরা। ডানকানের আর্থিক সমস্যার কারণ সন্ধান করতে গিয়ে বিআইএফআর-এর তদন্তে এই আশঙ্কা সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক তাপসরঞ্জন মজুমদার তাঁর 'চা-শিল্পের সংকট, রটনা ও ঘটনা' শীর্ষক গ্রন্থে পরিষ্কারভাবেই উল্লেখ করেছেন, 'চা ব্যবসাতে ডানকানস গোয়েঙ্কার আর্থিক সংকট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বা কার্যকরী পুঁজির অভাবজনিত কারণে হয়েছে। কোনও কোম্পনির স্বল্পকালীন আর্থিক দায়বদ্ধতা অর্থাৎ নিয়মিত বেতন প্রদান ইত্যাদির দায়িত্বপালনে অক্ষমতা থেকেই এই অভাব স্পষ্ট হয়। বিআইএফআর স্পষ্ট জানিয়েছে, ডানকানের চা-ক্ষেত্রে সংকটের কারণ চায়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। ক্রমাগত লোকসানে চলা সার কারখানার কারণেই এই সংকট।' চা-বাগান সংগ্রাম সমিতি উত্তরবঙ্গব্যাপী ডানকানসের শ্রমিক শোষণ নিয়ে জনমত গঠনে নেমেছেন, এবং তাঁদের যুক্তিসংগত প্রশ্ন, যে মালিকগোষ্ঠী শতাধিক অনাহারক্লিষ্ট মানুষের মৃত্যুর জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী, তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে না কেন? বিচারের বাণী আর কতদিন নীরবে নিভৃতে কাঁদবে? স্বাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশের চেয়েও ঘৃণ্য শ্রমিক শোষণ চলবে আর আমরা দেখেও না দেখার ভান করে থাকব? জবাব দেবে কে?

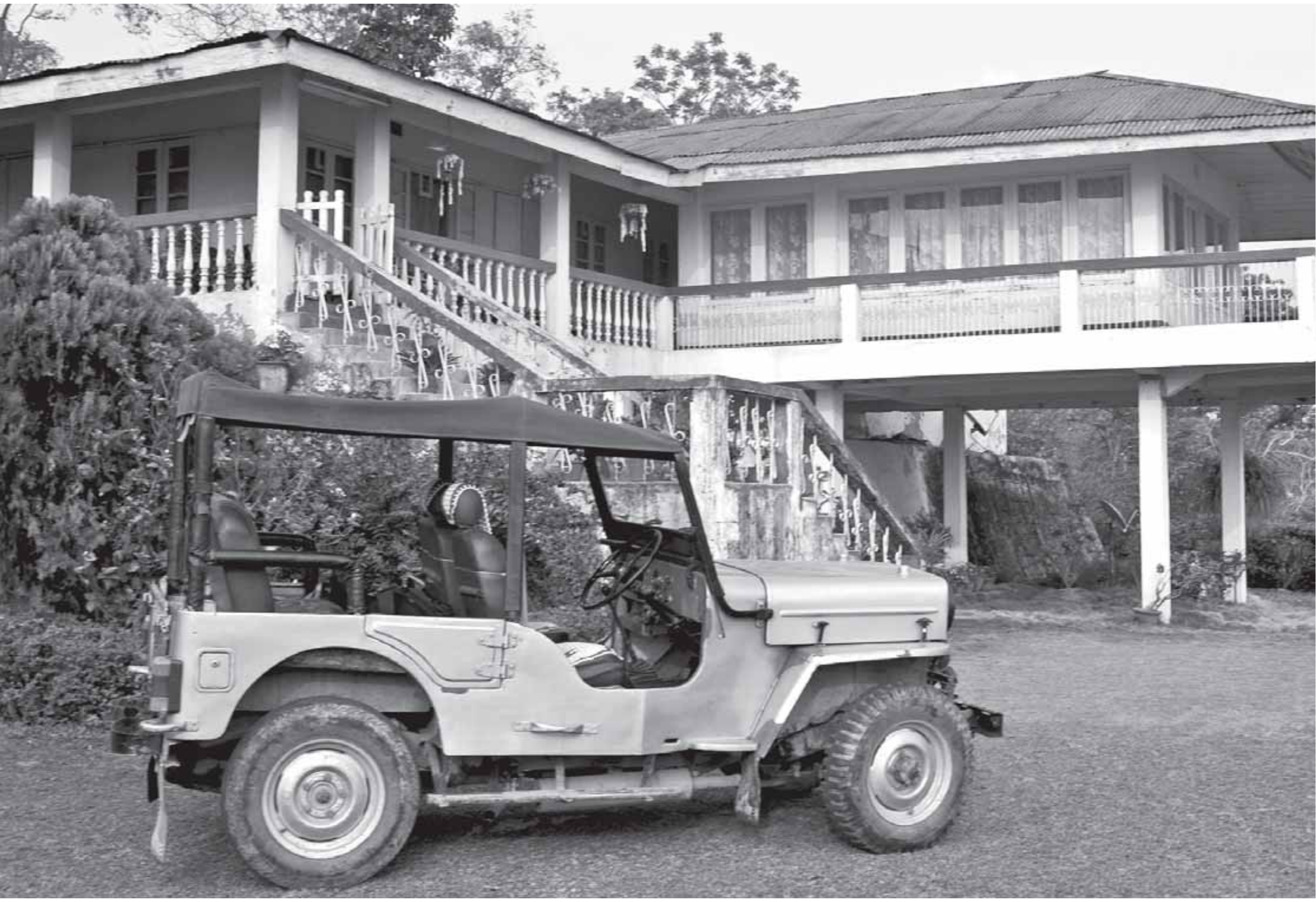

# একশ’ বছরের পুরনো চা-বাগান ‘মিশন হিল’ উত্তরের অহঙ্কার

মেঘ, চা-বাগান আর পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে গাড়ি ছুটেছিল সাতসকালেই গোরুবাথানের দিকে। গোরুবাথানে পৌঁছাতেই শুরু হল ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। পাশে বয়ে চলা তিস্তার শাখানদী চেল যেন তখন ভয়ংকর রকমের সুন্দর। চেলের গর্জন, পাহাড়, ঝরনা, প্রকৃতির সব রূপ একসঙ্গে মিশে সে এক স্বর্গীয় অনুভূতি। শুধু দু’চোখ ভরে উপলব্ধি করা যায়। ক্যামেরার লেন্স তাকে ছুঁতে পারে না। চিকেন মোমো সহযোগে দুপুরের লাঞ্চ সেরে বৃষ্টি একটু কমতেই আমরা রওনা দিলাম ঝান্ডির দিকে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর মেঘ স্বাগত জানাল ঝান্ডি ইকো হাটে। আসার পথেই আমরা ঠিক করে নিয়েছিলাম,

পায়ে হেঁটে ঘুরব। সেইমতো রাস্তাঘাট জেনে বেরিয়ে পড়লাম। সন্ধ্যাবেলা কফির কাপ হাতে তাকাতেই চোখে পড়ল পাহাড়চূড়ায় অকাল দীপাবলি। পরদিন ব্রেকফাস্টের পর প্রায় চার কিলোমিটার হাঁটলাম। পথের মাঝে পাহাড়ি গ্রাম, ঝরনা। চা-বাগান, মেঘের সঙ্গে লুকোচুরিতে মাঝেমধ্যেই হার মানছিল পাহাড়।

মিশন হিল চা-বাগিচার নাম শুনেছিলাম। ঝান্ডি এসেছি যখন, তখন ভাল চা-পাতা কেনার একটা লক্ষ্য ছিলই। সেই লক্ষ্যপূরণ হল মিশন হিল চা-বাগানে ফিল্ড সার্ভেতে গিয়ে। শতাব্দীপ্রাচীন চা-বাগিচা। মালিকানা হস্তান্তর হলেও বাগানের সেই ব্রিটিশ বনেদিয়ানা এখনও অটুট। বাগানের বর্তমান মালিক নীলমণি রায়দের বাড়ি এখন মালবাজারে। আশা টি কোম্পানির মালিকানায় নীলমণি রায়দের নিজস্ব বাগান এবং নিজস্ব ফ্যাক্টরি ও নিজস্ব মার্কেটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে চা বিপণন হয়। বাগানে

উৎপাদন, বিপণন এবং বণ্টন— এই তিনটি দিকের দু'টি দেখেন শুচিস্মিতা রায়, কোম্পানির সিইও। পরিকল্পনার কথা তাঁকে বলতে প্রথমে তিনি গররাজি, তারপর নিমরাজি এবং অবশেষে নিজেই শুরু করলেন আলাপচারিতা। জানলাম একটা অসাধারণ গুণমানসমৃদ্ধ বাগানের রূপকথা, যে বাগানকে তিলে তিলে গড়ে তুলছেন নীলমণি রায় এবং তাঁর পরিবারবর্গ।

মালবাজারে বিশাল দোকান তথা শোরুম মিশন হিল টি কোম্পানির। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে রওনা দিলাম চা-বাগানের দিকে। ডামডিম মোড় থেকে রানিচেরা চা-বাগান হয়ে অসাধারণ সুন্দর পথ সোজা গোরুবাথান চলে গিয়েছে। মসৃণ পিচ-ঢালা পথ, দু'পাশে সবুজে সবুজ। গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনে পাহাড় বিপর্যস্ত না হলে এ পথের প্রতিটি বাঁকে লুকিয়ে রয়েছে পর্যটন সম্ভাবনা।

মালবাজারের একটি বিখ্যাত চা কোম্পানি আশা টি কোম্পানি। নীলমণি রায় জলপাইগুড়ি জেলার চায়ের ইতিহাসে একটি নাম। বনেদি এই পরিবারটি যে চা-বাগিচাক্ষেত্রে তাঁদের মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছেন, সেই বাগানটির নাম মিশন হিল। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মায়াজালে আবৃত এই চা-বাগানটিতে গেলে মনপ্রাণ ভরে ওঠে। কালিম্পং জেলায় অবস্থিত আশা টি কোম্পানির অন্তর্ভুক্ত এই বাগানটির চায়ের গুণগতমান ভীষণই ভাল। দার্জিলিং টি অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত মিশন হিল চা-বাগানে ১৯৯৪ সালে বর্তমান কোম্পানিটি তাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। বর্তমানে বাগানে ছ'জন ম্যানেজমেন্ট স্টাফ, যাঁরা বাগান পরিচর্যা, উৎপাদন ফ্যাক্টরির কর্মকাণ্ড, শ্রমিক সমস্যাগুলিকে যৌথ নেতৃত্বের মাধ্যমে সমাধা করেন। যখন মিশন হিল বাগানে শতাব্দী এক্সপ্রেসের জন্য সার্ভেতে পৌঁছালাম, তখন পেলাম না ম্যানেজারকে। বাগানে একটাই ট্রেড ইউনিয়ন— দার্জিলিং-তরাই-ডুয়ার্স প্ল্যান্টারস' লেবার ইউনিয়ন।

বাগানের মোট আয়তন ৩৮০.২৪ হেক্টর। বাগিচার মোট 'প্ল্যান্টেশন এরিয়া' অর্থাৎ আবাদি অঞ্চল ২৪৪.১৮ হেক্টর। প্রতি হেক্টর জমিতে ১০০০ কেজি চা-পাতা উৎপাদিত হয়। বর্তমানে বাগানে কর্মচারীর সংখ্যা ৩৪। করণিক আছেন ৬ জন। ক্লারিক্যাল বা টেকনিক্যাল স্টাফ ৩ জন। বাগিচার ২৫০টি পরিবারে মোট ১৯০৩ জন বাস করেন। দৈনন্দিন ভিত্তিতে শ্রমিক ৪৮৯ জন। ফ্যাক্টরিতে কাজ করা শ্রমিকের সংখ্যা ৬০ জন। কম্পিউটার অপারেটর ১ জন। সাব-স্টাফ ৩৪ জন। ক্লারিক্যাল স্টাফ ৯ জন। অর্থাৎ স্থায়ী শ্রমিকসংখ্যা ৫৯৩। আর অস্থায়ী শ্রমিকসংখ্যা ১৩১০। বাগিচায় মোট উৎপাদিত পাতা গড়ে সাড়ে আট থেকে ন'লাখ কেজি। নিজস্ব উৎপাদিত চা প্রায় ২১১০৯০ কেজি। পুরো চা অর্থোডক্স এবং ইনঅর্গ্যানিক। বাগানগুলির মধ্যে একটি অন্যতম বাগান মিশন হিল।

মিশন হিল চা-বাগিচা এসজিআরওয়াই বা এমজিএনআরইজিএস-এর কোনও প্রকার সুবিধা পায় না। ব্যাঙ্ক থেকে বা অন্য কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণও নেননি কর্তৃপক্ষ। কোম্পানির লিজ আশা টি কোম্পানির নামে। লিজ প্রযুক্ত ছিল ২৪.০৮.২০০২ পর্যন্ত। লিজের পুনর্নবীকরণের জন্য আবেদন করা হয়েছে ২৬.০৩.২০০২-তে। বাগিচায় পাকা বাড়ির সংখ্যা ৪টি। ১৬৪টি আধা পাকা-আধা কাঁচা শ্রমিক আবাস। অন্যান্য বাড়ির সংখ্যা ১৫৭। মোট বাড়ির সংখ্যা ৩২৯টি। অন্য দিকে শ্রমিকসংখ্যা ৫৯৩। অর্থাৎ মোট শ্রমিকের ৫৫ শতাংশ এখনও গৃহহীন। ২০১১ সালে ৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা এবং ২০১২ সালে দেড় লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছিল শ্রমিকদের পাকা বাসগৃহ নির্মাণের জন্য। তারপরে আর কোনও টাকা সেই অর্থে খরচ করা হয়নি। প্রতি বছর শ্রমিক আবাস মেরামতির জন্য গড়ে ২ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়। বিগত চার বছরে ২০৯৬৮০৮ টাকা নতুন শ্রমিক আবাসগৃহ নির্মাণে, মেরামত বাবদ খরচ করা হয়েছে। শ্রমিক আবাসে ২৫০টি পরিবারে পায়খানার সুবন্দোবস্ত আছে।

বাগিচায় কোনও হাসপাতাল নেই, ডিসপেনসারি আছে আলাদা। পুরুষ বিভাগের ডিসপেনসারির সংখ্যা ২, মহিলাদের ওয়ার্ড ২, মেটারনিটি ওয়ার্ড ১টি। আলাদা কোনও অপারেশন থিয়েটার নেই। বাগানে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা আছে। গড়ে ২৫০ জন শ্রমিককে প্রতি বছর চিকিৎসার

নীলমণি রায় জলপাইগুড়ি জেলার চায়ের ইতিহাসে একটি নাম। বনেদি এই পরিবারটি যে চা-বাগিচাক্ষেত্রে তাঁদের মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছেন, সেই বাগানটির নাম মিশন হিল।

জন্য বাইরে পাঠানো হয়। বাকি চিকিৎসা বাগিচার ডিসপেনসারিতেই হয়। বাগানে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। বাগিচায় নিজস্ব ডাক্তার নেই। একজন এমবিবিএস ডাক্তার ভিজিটিং ডক্টর হিসাবে বাগিচায় স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করে থাকে। বাগিচায় নার্সের সংখ্যা ১। এ ছাড়াও ১ জন করে কম্পাউন্ডার, হেল্‌থ অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত ওষুধ পাওয়া যায়। ডায়েট চার্টেরও ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক বছর গড়ে ১৫ জন মহিলা শ্রমিক মাতৃত্বকালীন সুবিধা বাগিচার এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে পেয়ে থাকে।

বাগিচায় লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার আছেন। নাম নারায়ণ টপ্পো। রাজ্য

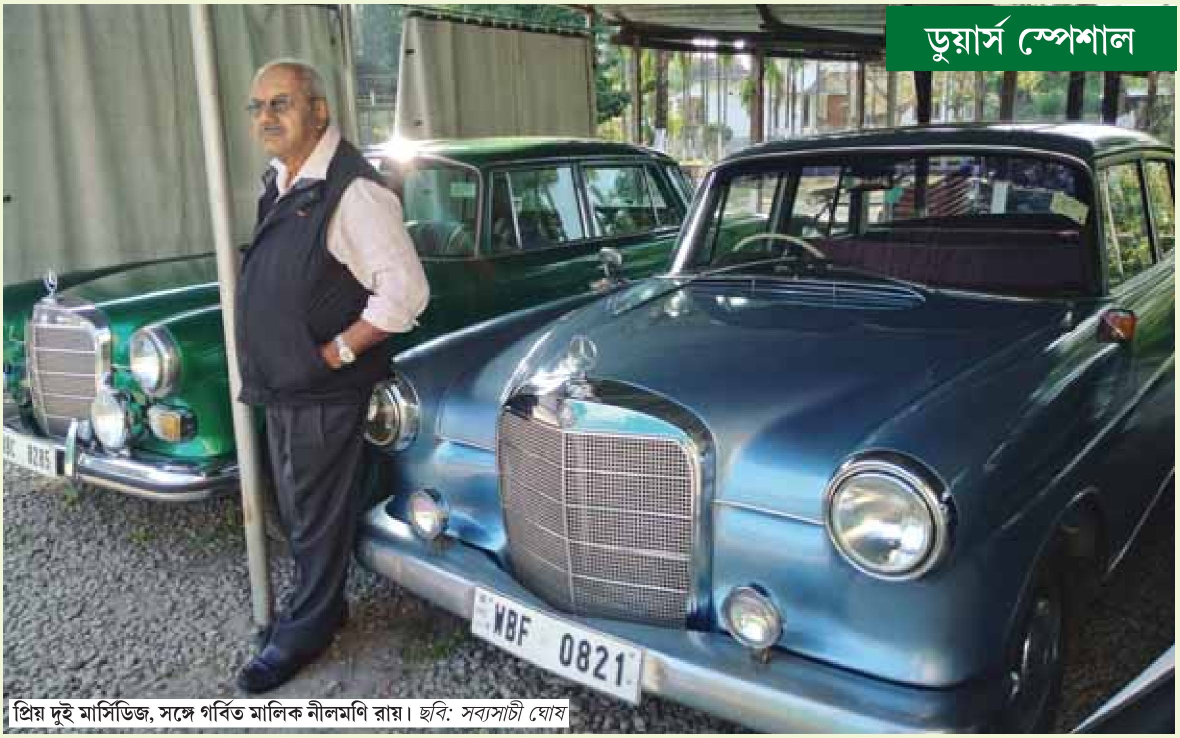

প্রিয় দুই মার্সিডিজ, সঙ্গে গর্বিত মালিক নীলমণি রায়। *ছবি: সব্যসাচী ঘোষ*

# ডুয়ার্সে ব্যোমকেশ ও ওয়ান নাইনটি মার্সিডিজ!

অঞ্জন দত্তের ‘আবার ব্যোমকেশ’ই হোক কিংবা অরিন্দম শীলের ‘ব্যোমকেশ পর্ব’ সর্বত্রই কিন্তু উপস্থিত ওয়ান নাইনটি। দুই পরিচালকের মধ্যে রেশারেশি এতটাই যে দুইজন পরবর্তীতে নিজেদের ব্যোমকেশ হিসাবে দুই নায়ককে বেছে নিয়েছেন কিন্তু ওয়ান নাইনটির জন্যে দুজনেই সমান নাছোড়। ডুয়ার্সের লোকেশনে শুট করতে এসে তাই তাদের প্রথম লক্ষ্যই হয় ওয়ান নাইনটিকে জোগাড় করে ফেলা। না, ওয়ান নাইনটি কারও গোপন নাম নয়। ওয়ান নাইনটি আসলে ১৯৬২ সালে তৈরি একটি মার্সিডিজ গাড়ি। পরিচালকদের চোখে এই গাড়িটিই ব্যোমকেশের বাহন হিসাবে প্রথম পছন্দ। মালবাজারের বাসিন্দা উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট শিল্পপতি তথা মিশন হিলস চা-বাগানের কর্ণধার নীলমণি রায়ের গ্যারাজ আলো করে থাকে একটি নয়, দু’ দুটি মার্সিডিজ। এই ওয়ান নাইনটি সেই গ্যারাজেরই অন্যতম রত্ন। ২০১২ তে অঞ্জন দত্ত যখন ‘আবার ব্যোমকেশ’-এর জন্য ডুয়ার্সে ঘাঁটি গাড়েন তখন প্রথমেই ব্যোমকেশের জন্যে জুতসই গাড়ি খোঁজার কাজ শুরু হয়। আর সেই খোঁজ এসে শেষ হয় নীলমণি রায়ের রয় অ্যান্ড কাজিন সংস্থার গ্যারাজে। এরপর ২০১৬-এর ডিসেম্বরে মুক্তি পাওয়া অরিন্দম শীলের ‘ব্যোমকেশ পর্ব’-তেও সেই একই আকাশনীল রঙের মার্সিডিজ-এই চড়তে

দেখা যায় ব্যোমকেশ আবীর চট্টোপাধ্যায়কে।

একাশি পেরিয়ে এখনও তরুণ, টগবগে পেটানো স্বাস্থ্যের অধিকারী নীলমণি রায়ের কাছেই শোনা গেল এই ওয়ান নাইনটি-র কাহিনি। তাঁর রয় অ্যান্ড কাজিন সংস্থার পেট্রোল পাম্পের সঙ্গেই বড় গ্যারাজ ঘর। গাড়ি অনুরাগীরা পাম্পে তেল ভরতে এসে দুই মার্সিডিজের দর্শনও করে যান। মার্সিডিজ যে এ তল্লাটে শুধু নীলমণি বাবুর সংগ্রহেই আছে সেই খবর পৌঁছে যায় ব্যোমকেশ পরিচালকদের কাছেও। নীলমণিবাবু বলেন, ‘মার্সিডিজ গাড়িদুটো আমার একান্তই ব্যক্তিগত ভালবাসার জায়গা জুড়ে আছে’। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মার্সিডিজের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়েন তিনি। রাজশাহীর নাটোর এলাকায় ক্ষত্রিয় রাজপুত বংশে জন্ম নীলমণিবাবুর। ১৩ বছর বয়সেই জলপাইগুড়ি শহরে চলে আসতে হয়। এরপর জ্যাঠামশাইয়ের ব্যবসায় কাজ করে খুব লড়াই করে পড়াশোনা শেখা। ৫০-এর দশকে শিলিগুড়ির আজ যেখানে দার্জিলিং মোড় সেখানেই এক চেনাশোনা ব্যবসায়ীর স্ট্যান্ডার্ড এইট ট্যুরার মডেলের গাড়িতে স্টিয়ারিং শুধু হাতে ধরেছিলেন বলে অপমান করে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাকে। সেই থেকে জেদ চেপে যায় যুবক নীলমণির। গাড়ির প্রতি টানটা ছিল বরাবরই। এরপর ব্যবসায় সাফল্য শুরু হতেই সেরার সেরা গাড়ি মার্সিডিজ কিনতে খোঁজ শুরু করে দেন। সে সময় এখনকার মতো এদেশে শোরুম খুলে বসেনি মার্সিডিজের মতো কোম্পানি। বরং বলা যায় তা ছিল ভাবনারও অতীত।

এদেশের কোনও এক পাইলট লিয়েন নিয়ে পাঁচ বছর নাইজেরিয়ায় কাটিয়েছিলেন। তিনিই নাইজেরিয়া থেকে ওয়ান নাইনটি মার্সিডিজটি কিনে কলকাতায় নিয়ে আসেন। কিন্তু এদেশে মার্সিডিজ পোষার হাজারো খরচ দেখে বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সালটা ছিল ১৯৭৪। অর্থাৎ আজ থেকে তেতাল্লিশ বছর আগে ৪৫ হাজার টাকায় সেই ওয়ান নাইনটি মার্সিডিজ কিনে ফেলেন নীলমণিবাবু। কলকাতা থেকে সেই গাড়ি একাই চালিয়ে মালবাজারে পৌঁছে যান তিনি। তারপর গাড়িটিকে চাঙ্গা করতে খরচা করেন পাক্কা এক লাখ টাকা। তার পরের বছর কলকাতা থেকেই কেনেন আরও একটি মার্সিডিজ, ১৯৬৫ সালের টু হানড্রেড মডেল, স্পোর্টর্স এডিশনের বিশেষ গাড়ি।

আজও তাঁর দুই সাধের মার্সিডিজ গাড়ির যত্নআত্তি হয় ঠিক প্রথম দিনগুলির মতোই। ছত্রিশ বছরের বিশ্বাসী চালক করমা লামা প্রতিদিন দুই মার্সিডিজের যত্ন নেন। সিনেমাতে ব্যবহারের সময়ও করমা ছাড়া মার্সিডিজ অন্য কেউ চালাবে না বলেই নির্দেশ ছিল নীলমণিবাবুর। তাই এই করমা লামাকেই দুই ব্যোমকেশেই চালকের ভূমিকায় দেখা যায়।

তবে সংসারে ছোট ছেলে যেমন একটা আলগা ভালবাসার জায়গা পায় তেমনই তিন বছরের ছোট বড় দুই মার্সিডিজ সন্তানের মধ্যে ছোটটির প্রতিও আলাদা টান আছে নীলমণি বাবুর। নিজেই বললেন, ডাবল কার্বোরেটর যুক্ত এই গাড়িটির গতিই অন্য ধরনের। কিন্তু কেন যে এটাকে সিনেমাওয়ালারা চান্স দেয় না সেটাই বুঝে উঠতে পারেন না তিনি। তবে সিনেমাতে তাঁর সাধের মার্সিডিজ দেওয়ার ব্যাপারে একেবারেই অনিচ্ছুক তিনি। জানালেন, অঞ্জন দত্ত এবং পরে অরিন্দম শীল ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেছিলেন বলেই রাজি হন। এর আগে রাজা সেনের 'দেশ' সিনেমায় নীলমণিবাবুর আরেকটি শখের পেট্রোল জিপও ব্যবহারের জন্য দিতে হয়েছিল। সিনেমার পর্দায় জয়া বচ্চনকে যেটাতে চাপতে দেখা যায়। নীলমণি রায়ের সোজা কথা হল, আমার শখের গাড়ি সিনেমার কাজে পাঠানোটা আমার নাপসন্দ। স্রেফ অনুরোধ রাখতে গিয়েই সিনেমাতে দিয়েছি মাত্র।

**সব্যসাচী ঘোষ**

# মিশন হিলস

১৮ পাতার পর

সরকারের শ্রম দপ্তরের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। ২০১১ সালে তিনি বাগানে কাজে যোগদান করেছেন। বাগিচায় ক্যান্টিনের সুবিধা আছে। ক্যান্টিনে ভরতুকি প্রদান করা হয়। কোনও দ্রব্যের দাম নোটিশ বোর্ডে ঝোলানো থাকে। বাগিচায় শিশুদের দেখভালের জন্য ক্রেশ আছে দু'টি। জামাকাপড় ধোয়া-কাচার ব্যবস্থা আছে। শৌচাগার আছে। মোট আয়া ৪ জন। বাচ্চাদের দুধ, ফল দেওয়া হয় সামর্থ্য অনুযায়ী। বাচ্চাদের পোশাক-পরিচ্ছদও সরবরাহ করা হয়। পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত আছে। তবে বাচ্চাদের বা শ্রমিক শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়ে যাবার জন্য পরিবহণের কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বাগিচায় শ্রমিকদের জন্য রিক্রিয়েশন ক্লাব আছে। খেলার মাঠও আছে, তাতে নানা প্রকার খেলাধুলার সুবন্দোবস্ত আছে। বাগিচায় চুক্তি অনুযায়ী শ্রমিকদের মজুরি ঠিকঠাকমতো প্রদান করা হয়ে থাকে। গত চার বছরে মোট ৭০ জন শ্রমিক গ্র্যাচুইটি পেয়েছেন। বাগিচায় কোনও মজুরি বকেয়া নেই। বাগিচায় বোনাসের শতকরা হার ২০ শতাংশ। মোট শ্রমিক ৫৩১ জন। মোট ২৯৩৬৫৩৮ টাকার বোনাস মেটানো হয়েছে। বোনাসের কোনও অর্থ বকেয়া নেই। প্রত্যেক বছর নির্দিষ্ট সময়ে বাৎসরিক রিটার্ন দাখিল করা হয়।

দার্জিলিঙের অন্য সুবিখ্যাত চা-বাগিচাগুলির মতোই দার্জিলিং চায়ের ইতিহাস এবং উত্তরাধিকারকে বিশ্বের বাজারে পৌঁছে দিতে যে বাগিচাগুলি এখনও তাদের ঐতিহ্যকে বজায় রেখেছে, তাদেরই একটি মিশন হিল চা-বাগান। হিমালয় পর্বতের পাদদেশে এই সুবিখ্যাত চা-বাগানটি প্রায় ৯৫১.০২ একর বিস্তৃত বাগিচাক্ষেত্র নিয়ে সুগন্ধি চা-নির্মাণকার্যে প্রায় শতাব্দীকাল জুড়ে নিয়োজিত। সবুজ বাগিচাক্ষেত্র, ছোট ছোট স্বচ্ছ জলপ্রবাহ মিশ্রিত পাহাড়ি ঝোরা, বরফে আবৃত পর্বতমালা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্বর্ণখনি কালিম্পঙে পাহাড়ের পাদদেশে এই বাগান। দার্জিলিঙের এটি একটি অন্যতম চা উৎপাদক এস্টেট। উচ্চতা, আবহাওয়া এবং পর্যাপ্ত বৃষ্টির কারণে মিশন হিল বাগিচা থেকে উৎপন্ন চা স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয়। অর্থোডক্স চা উৎপাদক বাগিচা হিসাবে সুনামের অধিকারী বাগানটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা বাগানটির লিজের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল ১৯২২ সালে এবং বাগানটির ফ্যাক্টরির লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছিল ১৯২৮ সালে। তখন থেকেই এই বাগানটি সুস্বাদু চা, যা স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয়, সেই চা পরিবেশন করে চলেছে।

মিশন হিল নামকরণের পিছনে অন্য ব্যাখ্যা আছে। স্কটিশ মিশনারিরা ধর্মপ্রচার এবং শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যে একটি নির্দিষ্ট 'মিশন' বা লক্ষ্য নিয়ে এই অঞ্চলে এসেছিল। ঊনবিংশ শতকের মাঝের দশকে ব্রিটিশরা গ্রীষ্মকালীন শৈলাবাস বানানোর লক্ষ্যে এই অঞ্চল অধিগ্রহণ করে। তাদের সরকারি অফিসারদের এবং দুর্বল, আঘাতপ্রাপ্ত বা অসুস্থ সিপাহিদের থাকা এবং বিশ্রামের জন্য তারা সিকিমের রাজার কাছ থেকে এই সামগ্রিক অঞ্চলের জমি নিয়ে নেয়। কিছুদিনের মধ্যেই ব্রিটিশরা বুঝতে পারে, এই অঞ্চলে রয়েছে বহুবিধ সুযোগসুবিধা এবং এই অঞ্চলের মাটি ও আবহাওয়া চা-চাষের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। তারা চিন থেকে চা গাছ এনে রোপণ করল এবং জঙ্গল সাফ করে স্থানীয় মানুষজনকে কাজে লাগিয়ে চা-বাগিচা গড়ে তুলতে লাগল। ইতিহাস ঘেঁটে আন্দাজ করা যায়, ১৯০৩ সালে এই চা-বাগান তৈরির কাজ শুরু হয়।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৩০০-২৩০০ ফুট উচ্চতায় এই চা-বাগিচা কালিম্পং জেলার গোরুবাথানে অবস্থিত। দার্জিলিঙের ৮৭টি বাগিচার মধ্যে মিশন হিল চা-বাগানও একটি বাগিচা, যারা দার্জিলিং চায়ের ব্র্যান্ড লোগো ব্যবহার করতে পারবে। অর্থাৎ এর অর্থ, বাগানটি সেরা গুণগতমানসম্পন্ন দার্জিলিং চা উৎপাদন করতে সক্ষম এবং এর জন্য আলাদা করে কোনও প্রকার ফ্লেভার ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে না। দার্জিলিং চা এবং অর্থোডক্স গ্রিন টি উৎপাদনকারী এই বাগান বছরে ২ লক্ষ ৬০ হাজার কেজি চা উৎপাদন করে, যার মধ্যে ৪৫ শতাংশ 'লিফ', ৩০ শতাংশ 'ব্রোকেন' এবং ২৫ শতাংশ 'ফ্যানিংস'। বড় ক্রেতাদের কাছে বাগিচা উৎপন্ন চা অকশনের মাধ্যমে বিক্রি হয়। বড় বড় ব্র্যান্ডেড কোম্পানি, যারা আন্তর্জাতিক স্তরে চা নিয়ে ব্যবসা করে মিশন হিল চা-বাগিচার চা নিয়ে, তারাই আন্তর্জাতিক মাপের ক্রেতা। আন্তর্জাতিকমানের চাহিদার কথা মাথায় রেখে কোম্পানি নিরাপদ এবং উন্নতমানের কৃষিজ প্রযুক্তি, জৈব সার ইত্যাদি ব্যবহার করে। বাগিচায় উৎপন্ন ফার্স্ট ফ্ল্যাশ চায়ের স্বাদ এতটাই অসাধারণ যে, এক কাপ চায়ের স্বাদ শুধু ঠোঁটেই লেগে থাকে না, একজন চা-পেয়ীকে দীর্ঘকালীন আনন্দ প্রদান করে থাকে এবং এনার্জি ও কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে মিশন হিল ব্র্যান্ডনেমের এক কাপ দার্জিলিং চা। বাগিচার চায়ের স্বাদ এতটাই অতুলনীয় যে, যিনি একবার এই চা পান করবেন, স্বাদ এবং গন্ধের বিচারে অন্য কোনও বাগানের চা তাঁর ভাল লাগতেই পারে না।

**গৌতম চক্রবর্তী**

# বালুরঘাটে সৌরভ গাঙ্গুলির মূর্তি ভাস্কর শিলিগুড়ির সুশান্ত পাল

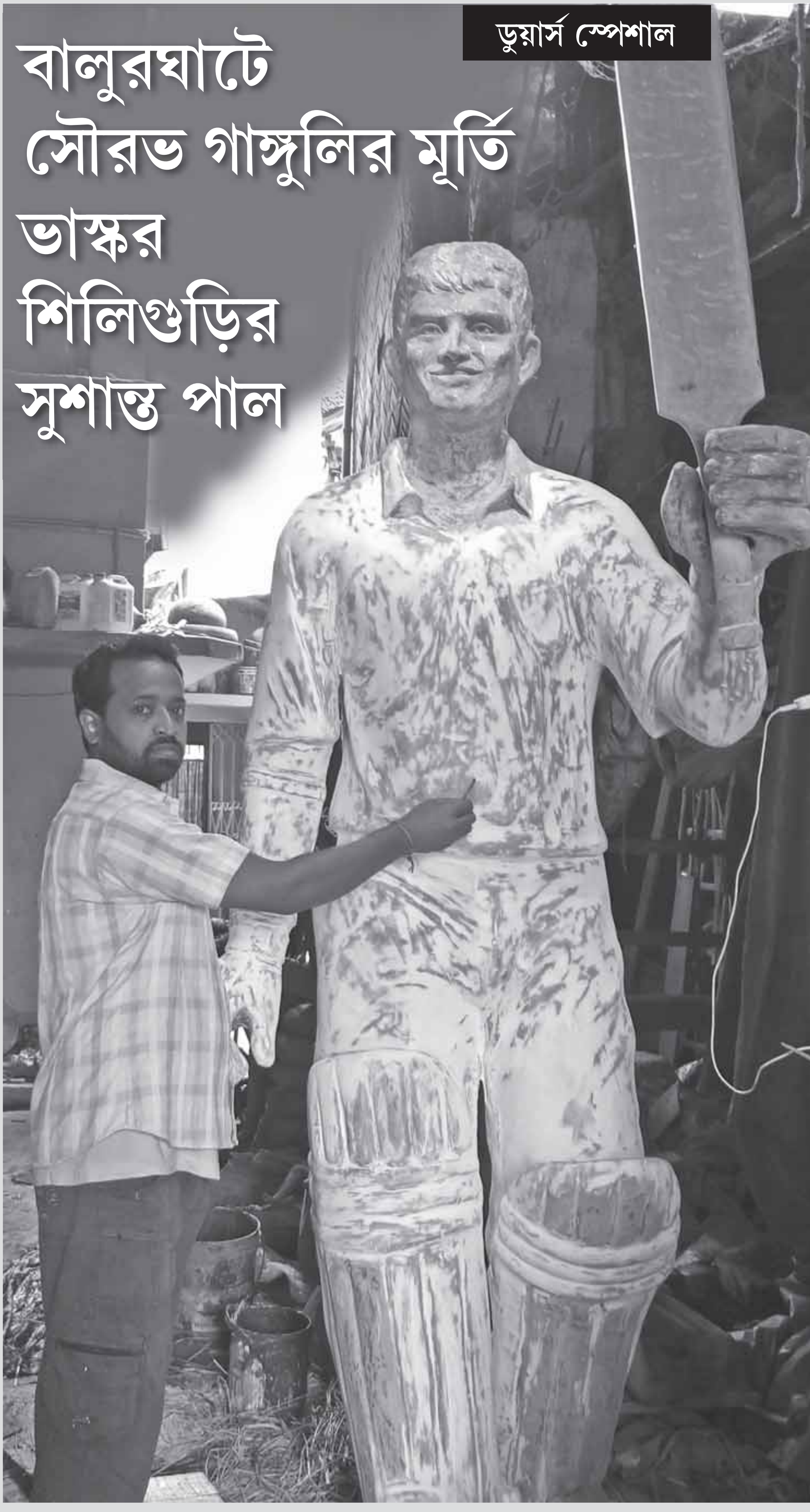

বালুরঘাটে ১৫ জুলাই ক্রিকেট তারকা সৌরভ গাঙ্গুলির পূর্ণ মূর্তির উন্মোচন। আট ফুট উচ্চতার সেই মূর্তি বসছে বালুরঘাট স্টেডিয়ামে। আর এই ঐতিহাসিক উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে বালুরঘাটে হাজির সৌরভ গাঙ্গুলি স্বয়ং। আর এই মূর্তি গত কয়েক মাস ধরে তিল তিল করে তৈরি করেছেন শিলিগুড়ির শিল্পী সুশান্ত পাল।

শিলিগুড়ির সুভাষ পল্লির তরুণ শিল্পী সুশান্ত কয়েক বছর আগে কলকাতা আর্ট কলেজ থেকে পাশ করেন। তারপর থেকেই ভাস্কর্যের কাজ নিয়ে তাঁর সাধনা শুরু। এর আগে দার্জিলিং-এর প্রয়াত বাম নেতা রতনলাল ব্রাহ্মণের মূর্তি তিনি গড়েন, সেটি বসেছে শিলিগুড়ি-দার্জিলিং মোড়ে। তা ছাড়া হায়দার পাড়াতে কালু পালের একটি মূর্তিও তিনি কয়েকদিন আগে তৈরি করেছেন। ছোট থেকেই আর্ট নিয়ে মেতে ছিলেন সুশান্ত। এবারে তাঁর কাছে ক্রিকেট তারকা সৌরভ গাঙ্গুলির মূর্তি তৈরির বরাত আসে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা স্পোর্টস সংস্থা থেকে। গত মাস ছয়েক ধরে মহারাজের মূর্তি তৈরির কাজ চলে। কাজটা আসলে দু'মাসের হলেও সময় লেগেছে বেশি। কারণ বারবার মূর্তির খানিকটা তৈরি করে তার ছবি তুলে সৌরভ গাঙ্গুলির কাছে পাঠাতে হয়েছে। সৌরভ অনুমোদন করেছেন, তারপর কাজ এগিয়েছে। ২০০৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ব্রিসবেনে অনুষ্ঠিত টেস্টে সেঞ্চুরি করেছিলেন সৌরভ। সেই ছবিই মূর্তিতে ফুটে উঠেছে। শিল্পী সুশান্ত বলেন, মূর্তিতে পায়ের প্যাড তৈরিতে খামতি ছিল। ছবি দেখার পর সৌরভই তা ধরিয়ে দেন। বলেন, 'এখন প্যাড অনেক আধুনিক হয়েছে। তখন কাপড়ের প্যাড ছিল'। এভাবেই মূর্তির বিভিন্ন অংশের ছবি দেখে সৌরভদা তা ঠিক করে দিয়েছেন। সেই অনুযায়ীই সংশোধন করা হয়েছে। প্রথমে মাটির মূর্তি, তারপর গ্লাস ফাইবারের কাজ। আর এটা তৈরি করতে দেড় লক্ষ টাকার বেশি খরচ হয়েছে। সুশান্তর দাবি, ভারতে কোনও জীবিত ক্রিকেট তারকার এইরকম ফাইবার মূর্তি এই প্রথম বসছে। ফলে তা নিখুঁতভাবে তৈরি করতে মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করেছেন এই শিল্পী। মূর্তিতে বিসিসিআই-এর একটি লোগোও তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

**বাপি ঘোষ**

# বৈকুণ্ঠপুর রাজদিঘি জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি শহরের বুকে বৈকুণ্ঠপুর রাজ্য এস্টেটের প্রাসাদের সামনে প্রায় ১৭ বিঘা আয়তনের রাজদিঘি শতাধিক বছরের কত-শত সাক্ষী বহন করে চলেছে নীরবে নিভৃতে। যতই খরা হোক, দিঘি খননের পর থেকে কোনওবারই ঐতিহ্যবাহী এই দিঘির জল শুকায়নি। দীর্ঘদিন ধরে বৈকুণ্ঠপুর রাজ এস্টেটের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছেন উমেশ শর্মা। তাঁর কাছ থেকে জানা যায়, রাজা দর্পদেব এই রাজদিঘি খনন করিয়েছিলেন। ১৮৩৪ সালে বর্তমান বাংলাদেশের দিনাজপুর থেকে জিয়ন গোমস্তা নামে এক ঠিকাদারকে রাজদিঘি খননের জন্য জলপাইগুড়িতে ডেকেছিলেন রাজা দর্পদেব রায়কত। দীর্ঘ আট বছর ধরে খননকাজ চালানোর পর ১৮৪২ সালে দিঘিটির খনন শেষ হয়। সে সময় কড়ি দিয়ে মূল্যনির্ধারণ হত। রাজা দর্পদেব ধামা ভরতি করে কড়ি দিতেন ঠিকাদার জিয়ন গোমস্তাকে। পরবর্তীতে ময়নাগুড়ি ব্লকের বাকালি এলাকায় রাজার দেওয়া এক বৃহৎ অঞ্চলের জোতদার হয়েছিলেন জিয়ন গোমস্তা। জলপাইগুড়ি শহরের বুকে জিয়ন একটি বাড়িও নির্মাণ করেছিলেন। নতুনপাড়ায় সেটিই এখন বাকালি হাউস নামে পরিচিত।

রাজ-আমলের ব্রাহ্মণরা রাজবাড়ির অন্ন-জল গ্রহণ করতেন না। তাঁরা রাজদিঘি চত্বরে থেকে সেখানেই নিজেরা রান্না করে আহার গ্রহণ করতেন। দিঘির পাশে থাকা শিব ও মনসা মন্দিরে পুরোহিত ও ভক্তরা রাজদিঘির জলে স্নান করতেন। তারপর মন্দিরে পুজো দিতেন। এলাকার যে কোনও পুজো-উৎসবে এই দিঘির জল ব্যবহার করতেন প্রজারা। মেচেনি, বেড়াভাসানির মতো নানান জনপদীয় পুজোপার্বণও এই দিঘির পাশেই সম্পন্ন হত। সে সময় রাজদিঘির জল ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। পানীয় জল হিসেবেও দিঘির জল ব্যবহার করতেন প্রজারা। জানা যায়, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনুশীলন চলত এই রাজদিঘি চত্বরে। স্বদেশি আন্দোলনের সময়কালে অনুশীলন সমিতির সদস্যরা এখানে অস্ত্রচালনার অনুশীলন করতেন। বন্দুকচালনা, লাঠি ছোড়া ইত্যাদির প্রশিক্ষণ চলত দিঘির পাশে জঙ্গলের মধ্যে।

রাজ-আমল শেষ হওয়ার পর দীর্ঘদিন অবহেলা আর অযত্নে পড়ে ছিল শতাব্দীপ্রাচীন রাজদিঘি। দিঘির চারদিকের পাড়ও ক্ষয়ে গিয়েছিল। সন্ধের পর থেকে অন্ধকারে ডুবে থাকা রাজদিঘি চত্বরটি সমাজবিরোধীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। অবশেষে নাগরিকদের নানা দাবিদাওয়ার পর রাজ্য সরকার দিঘিটির ঐতিহাসিক গুরুত্বকে স্বীকার করে এর সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের কাজে এগিয়ে আসে। শিলিগুড়ি- জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অর্থানুকূল্যে রাজদিঘিকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজদিঘির সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের উদ্‌বোধনও করেছেন।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এই রাজদিঘি রাজ-আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আজও সমান আকর্ষণীয়।

**শুভ্রজিৎ পোদ্দার**
ছবি- অনির্বাণ দেব

# জল আনে জিভে জলপাইগুড়ি

সাদা চামড়ার টুরিস্টরা কাশ্মীর-হিমাচল-গাড়োয়াল-কুমায়ুন ছেড়ে দার্জিলিং বেড়াতে আসে কেন? ঘনাদা থাকলে হয়ত ব্যাখ্যা দিতেন, পিতামহ-প্রপিতামহদের খেলনা রেল, চা-বাগানের জমিদারির এত গল্প শুনেছে যে, একবার চোখে না দেখলে বিশ্বাস হত না— তাই দার্জিলিং পাহাড়ে ‘গোরা’ টুরিস্টদের ভিড় জমে। তেমনই জলপাইগুড়ির বহু কৃতী মানুষ ছড়িয়ে আছেন পৃথিবীর নানা কোণে। তাঁদের উত্তরপ্রজন্মের কাছে জলপাইগুড়ির পুরনো গল্প তাঁরা নিশ্চয়ই করেন, যা শুনেটুনে মনে হতেই পারে, নাহ্, করলা ভ্যালির সেই রূপকথার শহরটা একবার না দেখে এলেই নয়! সেই বাসনায় জলপাইগুড়ি শহর খুব একটা জল ঢালবে না, সে ভরসা করাই যায়। অন্তত রসনায় তো বটেই। জলপাইগুড়ির সাবেকিয়ানার সঙ্গে যেসব খাদ্য প্রতিষ্ঠানের নাম মিলেমিশে আছে, তারাই আজও ভরসা জোগায়।

একটু মিষ্টি দিয়েই যদি শুরু করি, তবে বলব, ঢাকাই মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে একবার অন্তত ঢুকে কালাকাঁদ আর ছানার জিলিপিটা চেখে দেখবেন। সেই যে দুলাল পালের বাবা করে একটা ভাঙাচোরা মিষ্টির দোকান দিয়ে শুরু করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পরও, এখনও সেই একই রকমভাবে বহমান একই স্বাদের মিষ্টির এতটুকু হেলদোল হয়নি। দোকানটা অবশ্য কলেবর পালটেছে। প্রথমে ছিল এখনকার মেরিনা নার্সিং হোমের উলটো দিকে। তারপর এল ডিবিসি রোডে অবস্থিত এখনকার আর্যাবর্ত কমপ্লেক্সের উলটো দিকে। সবশেষে মাদ্রাসার লাগোয়া একখণ্ড জমিতে। এখনও সেখানেই আছে দোকান। কাঠের পাটাতন আর টিনের চালের বদলে এখন সিমেন্টের পাকাপোক্ত একটা ঘর হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হিসেবে যখন রাতারাতি চলে আসতে হয়েছিল এ দেশে, তখনই এই মিষ্টির দোকানের সূচনা। পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে চলে আসা একটা মিষ্টির দোকান, যেখানে না খেয়ে ফিরে গেলে কি জলপাইগুড়িকে পুরো জানা হল!

জলপাইগুড়িকে পুরোপুরি জানতে হলে বেশ কয়েকটি দোকানে খেতে হবে। সেগুলো একে একে সব বলব।

চলুন, এর পর যাওয়া যাক বিশ্বনাথের কচুরির দোকানে। বিশ্বনাথ কে ছিলেন জানেন? একজন অত্যন্ত সাধারণ মানুষ, যিনি কাজের খোঁজে বিহার থেকে জলপাইগুড়ি পাড়ি দেন ১৯৬৮-র শেষাশেষি। এসে দেখলেন কাজের সঠিক সন্ধান করা খুব কঠিন তাঁর পক্ষে। ভাবলেন, আপাতত পকোড়া নিয়ে সন্ধেবেলা রাস্তায় বসা যাক। কিছু না হোক, চলতি মানুষজন খেতে তো ভালবাসেই, কাজেই ভাজার দোকান দিলে অল্পবিস্তর চলবেই। যেমন ভাবা, তেমনই কাজ। পকোড়া বিক্রি বেশ জমেই গেল কয়েকদিনের মধ্যে। মনে মনে ভাবলেন, এর সঙ্গে যদি আর দুটো আইটেম বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে মন্দ হয় না। নিজের হাতের মুঠোর মধ্যেই আছে রান্নাটা। ভাজতে শুরু করলেন কচুরি। সেই সঙ্গে বানাতে লাগলেন জিলিপি। ঈশ্বর সহায় থাকলে যা হওয়ার তা-ই হল। হালকা হিঙের গন্ধ দেওয়া ফুসফুসে কচুরি, অচিরেই তার গুণের মহিমা ছড়াতে

*বাকি অংশ ২৮ পাতায়*

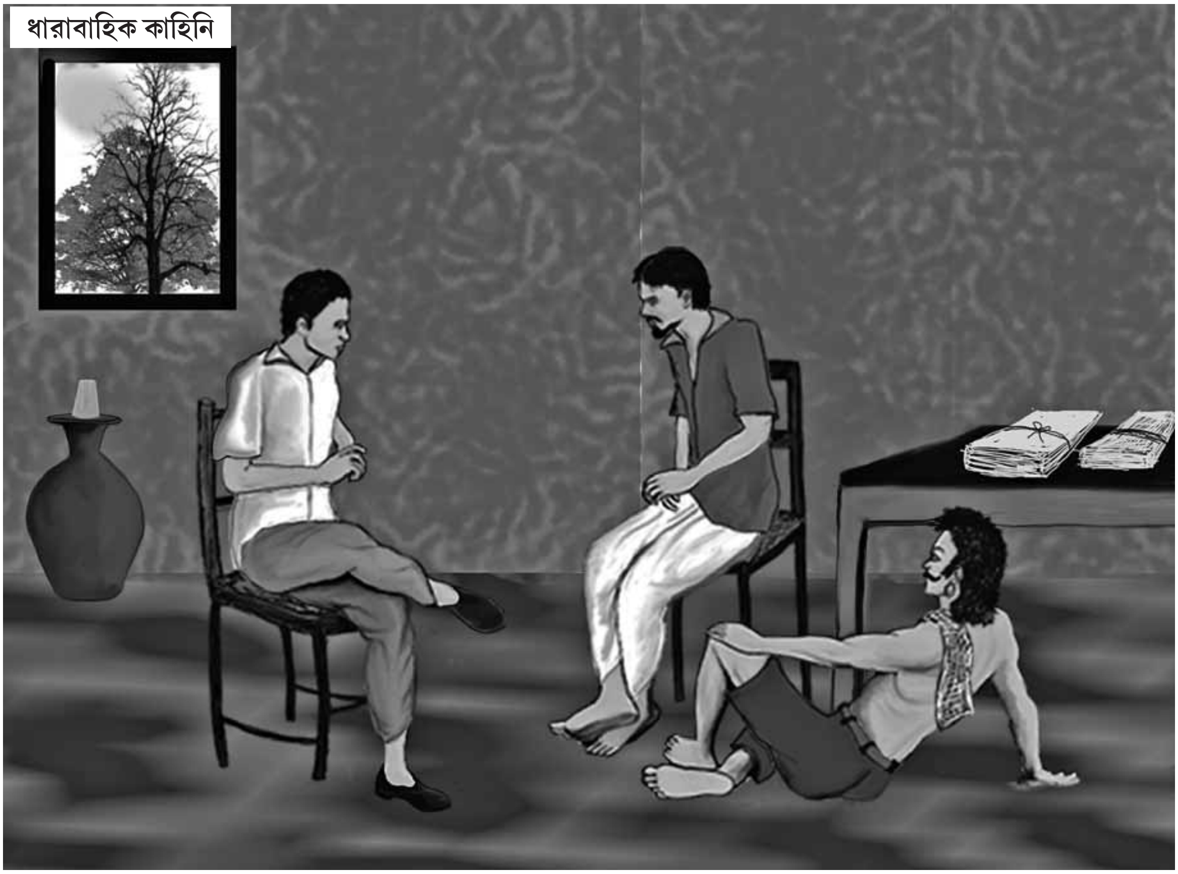


# তরাই উতরাই

৫১

হিদারু তার টাউনে দেখেছিল যে, পুজো উপলক্ষে বাগানের হেড আপিসগুলো প্রায় মাসখানেক বন্ধ থাকে। এখন বুঝতে পারছে যে, হেড আপিসে ছুটি থাকলেও বাগানে কাজ শুরু হয়ে যায় পুজো শেষের সঙ্গে সঙ্গে। আসলে হাতে গোনা কয়েকজন বাগানবাবুকে বাদ দিলে চা-বাগানের সিংহভাগই হল লেবার। এদের মধ্যে দেশি লোক বা মুসলিম নেই। কিছু পাহাড়ি লেবার বাদ দিলে কালো মানুষরাই সংখ্যায় বেশি। হিদারু এসব কালো মানুষের পরিচয় জানত না। এখন সে কিছু কিছু জেনেছে। কাঠকলের মালিক সত্যবাবু আর তাহের তাকে চিনিয়েছে অনেক কিছু, শিখিয়েছে আরও বেশি। এইসব কালো চেহারার মানুষ এসেছে অনেক দূর দেশ থেকে। যাদের হাত ধরে এরা বাগানের কাজে লেগেছে, তাদের বলা হয় সর্দার। বাগানে লেবার সাপ্লাই করে কমিশন পায় সর্দাররা। আইনের কাগজে টিপছাপ দিতে হয় লেবারদের। সে কাগজে কী লেখা আছে তা পড়তে জানে না তারা। একবার সই করলে কমপক্ষে চার বছরের জন্য লেবারগিরি করতেই হবে। ইচ্ছে থাকলেও কাজ ছেড়ে যাওয়া চলবে না।

অবশ্যি কাজ ছেড়ে কেউ যেতে চায় বলেও মনে হয়নি হিদারুর। লেবারের কাজে খাটনি খুব। সকাল সাতটা থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাজ। এখনও শীতকাল আসেনি। কিন্তু হিদারু শুনেছে, বর্ষার মতো এদিকে শীতটাও পড়ে জব্বর। তা শীত বলো বা বর্ষা— লেবারদের অত ভাবলে চলবে না। কাজ তাদের করতেই হবে। মজুরি যে তারা খারাপ পায় তা বলা চলে না। মরশুমের সময় ওভার ডিউটি করে ভালই রোজগার করে তারা। পরিবারসুদ্ধ সবাই বাগানের কাজে যোগ দেয় বলে সব মিলিয়ে মাসে আয় মন্দ হয় না। টাউনের অনেক পরিবারের নগদ রোজগার লেবার পরিবারের চাইতে কম। কিন্তু জীবনযাপনের কথাটা ভাবলে টাউনের লোকের সঙ্গে তফাতটা চোখে লাগার মতো। বস্তুত, লেবারদের জীবনযাপনের ছিরি দেখে হিদারুর মন খারাপ হয়ে যেত গোড়ার দিকে। থাকার ঘর থেকে শুরু করে খাওয়ার জল— কোনওটাই ঠিকমতো পায় না তারা। মজুরির নগদ টাকার বেশির ভাগ উড়িয়ে দেয় হাটে জুয়া খেলে আর মদ গিলে। হাটের ব্যাপারীরা চার আনার জিনিস দশ আনায় বেচে ওদের কাছে। এমন একটা লেবার পরিবার পাওয়া শক্ত, যাদের মহাজনের কাছে কোনও ধার নেই। ধারের সুদ আবার বেজায় চড়া।

অরণ্য-ঘেরা বাগানগুলোর চমৎকার পরিবেশ দেখে হিদারুর গোড়ায় মনে হয়েছিল যে, এখানকার মানুষগুলো সবাই খুব সুখে থাকে। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তেমন নয়। বাগানের ম্যানেজার হল প্রায় রাজার মতো। তিনি একাধারে পুলিশ সুপার, আবার জজসাহেবও বটে। বাগানের মধ্যে তিনিই আইন। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার আর বাগানবাবুদের জীবনও বেশ মোলায়েম। ছোটখাটো রাজার মতোই জীবন কাটান তাঁরা। কিন্তু লেবারদের খুব কষ্ট। হিদারু বেশ বুঝতে শিখেছে যে, কেন তার মতো দেশি লোকেরা বাগানে লেবারের কাজ নিয়ে আসতে চায়নি।

স্থানীয় লোকেরা এ কাজে না আসার কারণেই দূর দেশ থেকে সর্দার লাগিয়ে লেবার আনতে হয়েছিল সাহেবদের।

গতকাল পুজো শেষ হয়েছে। তাহেরদের বাগানে বাবুরা পুজোর আয়োজন করেছিল। সেই উপলক্ষে বায়োস্কোপ দেখানো হয়েছে। বাবুরা দল বেঁধে অভিনয় করেছে। সেসব দেখতে উপচে পড়েছিল ভিড়। লেবাররা সকলেই বাংলা বোঝে। তবে তারা নিজেদের মধ্যে একটা বিচিত্র ভাষায় কথা বলে। হিদারু সে ভাষা বোঝে না খুব একটা।

সত্যবাবু সপ্তমীর দিন দেশে গিয়েছে। ফিরবে কোজাগরী পার করে। কাজকর্মের অবশ্য চাপ আছে এখন। হিদারু সেটা সামলে নিতে পারছে। রেল কোম্পানির অর্ডারমাফিক স্লিপার বানাতে হবে অনেক। এর জন্য ভাল চেরাইয়ের কাজ জানা লোক দরকার অন্তত আরও ডজনখানেক। লোকের খোঁজে লোক পাঠানো হয়েছে। হিদারুও ছোটাছুটি করছে। তার অবশ্য ছোটাছুটির দরকার ছিল না। কিন্তু অবস্থা এমন যে, কাজ করেও হাতে অনেক সময় থেকে যাচ্ছে। কাঁহাতক আর জঙ্গল-পাহাড়ের শোভা দেখে সময় কাটানো যায়? গঙ্গা ব্যানার্জি অবশ্য শিকারে যাওয়ার জন্য মাঝে মাঝেই হিদারুকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু শিকারের সঙ্গী হতে তেমন ইচ্ছে হয় না হিদারুর। মাঝে মাঝে তাহের এলে অবশ্য বেশ গল্প করে কাটানো যায়।

সকালে বসে তাহেরের সঙ্গে টাউনে দশমীর ঘাটের স্মৃতি রোমন্থন করছিল হিদারু। করলা নদীতে বিসর্জন দেখার অভিজ্ঞতা তাদের দু'জনেরই আছে। আপিসঘরে চেয়ারে বসে গল্প করছিল ওরা। সামনে মেঝেতে বসে মন দিয়ে তা শুনছিল ভূষণ সিং। ভূষণ একজন লেবার সর্দার। বিশ বছর হয়ে গেল, এদিককার বাগানগুলোতে লেবার সাপ্লাই করছে। নগদ রোজগারের ধান্দায় সে এদিকে প্রথমে এসেছিল লেবার হয়েই। বুদ্ধি খাটিয়ে আর সাহেবদের মন জুগিয়ে সে হয়ে গিয়েছে সর্দার। লোকটা মন্দ নয়, বাবুদের খুব খাতিরযত্ন করে। তবে সাহেব বলতে একেবারে অজ্ঞান। তার ধারণা, বাঙালি মালিকরা সাহেবদের মতো কড়া হতে পারে না। এই যে তাহেরদের বাগানের মালিক লেবারদের জন্য পাশ করা ডাক্তার আনছে, হসপিটাল বানাচ্ছে— এসব যুক্তিহীন। অসুখ করলে লেবাররা ওঝা-গুনিনদের কাছে যেতেই পছন্দ করে। বাগান থেকে একটা মাইনে করা ওঝা রাখলেই তো ঝামেলা চুকে যেত। বাবুদের জন্য ডাক্তার আনো— ঠিক আছে। বাবু শরীরে বিলিতি ওষুধ কাজ করে বটে! লেবারদের জন্য মদের উপর কোনও ওষুধ নেই।

বেশ কিছুক্ষণ গল্প করার পর তাহের বললেন, 'পুজোর রাতে বাবুদের প্লে দেখলে ভূষণ? কেমন লাগল?'

'ভাল।' ভূষণ সিং দেঁতো হেসে জানাল, 'তবে দু'বছর আগে সাহেবদের প্লে দেখেছিলাম বাবু গুড ভিউ বাগানে। তাঁদের ব্যাপারটাই আলাদা আছে। অইসন আলোর বাহার আগে দেখিনি। বাবুরা খারাপ করলেন না। লেকিন সাহেবদের কাছে কিছু না।'

'তুমি ইংরিজি বোঝো নাকি ভূষণ?' তাহের মিটিমিটি হেসে জিজ্ঞেস করেন।

ভূষণ সিং পুনরায় দেঁতো হাসি উপহার দিয়ে বলে, 'আরে রাম! আমি কেন আংরেজি জানব! তবে আওয়াজ শুনে তো কুছ বুঝা যায়। তারপর ধরেন, মেমসাহেবরা প্লে করলেন। সেসব দারুণ লাগল। বঙ্গালি বাবুদের মেমসাহেবরা তো ইস্টেজে উঠেন না।'

'কিন্তু বাঙালি বাবুরা কেমন মুভমেন্ট করছে জানো? সাহেবদের রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে।'

'বাগানে?' ভূষণ খুব আশ্চর্য হয়ে যায়। তাহের তার ভুল ভাঙিয়ে জানান যে বাগানে নয়, ব্যাপারটা ঘটছে বাগানের বাইরে যে বিরাট বাংলা দেশ আছে, সেখানে।

ভূষণ সেটা জানার পর আশ্বস্ত হয়ে বলে, 'সওদেশির কথা বলছেন তো? কাংরেস দল ফাইট দিচ্ছে ওদের নিয়ে। লেকিন সব তো জেলে ঘুসে গিয়েছে! গান্দি ভি ঘুসে গিয়েছে। আর ওই বঙ্গালি বাবু— বোসবাবু না কী যেন নাম?'

'সুভাষ বোস।' হিদারু ধরিয়ে দিল নামটা।

'সে-ও শুনলাম ঘুসে গেল।' বেশ আত্মতৃপ্তি নিয়ে জানাল ভূষণ সিং, 'বাগানে এসব নাই বাবু। এদিকে এসব করলে আলিপুরদুয়ারে ভেজে দিবে। বাক্সর জেল মে ভেজে দিবে। ওই জেল কি বাক্সের মতো হল নাকি বাবু?'

'কথাটা হল বক্সা।' বলে তাহের উঠে দাঁড়ালেন। চার দিন বন্ধ থাকার পর বাগান খুলেছে। তাঁর কিছু জরুরি কাজ আছে বাগানে। সন্ধের দিকে আরেকবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বাইরে অপেক্ষমাণ হাতির দিকে এগিয়ে গেলেন। ভূষণ সিং অবশ্য বসেই থাকল।

হিদারু তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার আজকে কাজকম্ম নেই ভূষণ?'

'কাল বাদে পরশু হাট। তার আগে আমি ফিরি থাকলাম। আপনের কোনও কাম থাকলে বলেন। বাজার আছে আপনার? মছলি নিবেন না?'

'এদিকে কেউ স্বদেশি করে না?' হিদারু হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল।

ভূষণ খুব অবাক হয়ে বলল, 'বাগান এলাকায় ওসব কী করে চলবে বাবু? আমি আশপাশের সব বাগানের লেবারদের চিনি। আর সব লোকদেরও ভি চিনি। কাংরেসের বাত করলে তুরন্ত খবর চলে আসবে। তবে বাত করলে সাহেবরা কুছু বলে না। লেকিন মিছিল-মিটিং করলেন কী গেলেন। আপনার টাউনে নাকি ওসব খুব চলে?'

'তা চলে।' হিদারু মলিন হাসে, 'সেখানেও স্বদেশিরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি থাকলে আমাকেও করতে হত স্বদেশি। তাই কাজের ধান্দায় চলে এলাম এখানে।'

'খুব ভাল করলেন।' ভূষণ সিং তারিফের সুরে বলল কথাটা, 'আমি তো ভাবলাম, আপনি ইখানে এলেন কেন টাউন ছেড়ে! পড়ালিখা জানা আদমি আছেন। নোকরি জুটে যেত আপনার। ম্যাট্রিক পাশ দিলেন কি আপনি?'

'নাঃ!'

'দিলে বাগানবাবুর নোকরি হয়ে যেত রানিঝোরা বাগানে। তবে কাঠের বিজনেস ভাল জিনিস আছে। একটা বাত বলি আপনাকে বাবু?'

'বলো।'

'ই শালা গান্দির লোকেরা বহুত হারামি আছে। আর কিছু বঙ্গালি আছে, সাহেবদের বোমা মারে— ও শালারা আরও বেশি হারামি!'

'এ কথা বলছ কেন?' হিদারু তেতো স্বরে জিজ্ঞেস করল।

ভূষণ সিং অবশ্য সেটা খেয়াল করল না। সে মহা উৎসাহে হাত নাড়িয়ে বোঝাতে লাগল সাহেবদের মাহাত্ম্য, 'ভাবেন আপনি! ফরেস্ট কাটল। রেল লাইন বসাল। বাগান বানাল। এসব আমরা পারতাম? কেউ পারত? আমি কোনও বোমা-মারা সওদেশি পাব তো এইসন চাবুক লাগব যে গাঁড় লাল হয়ে যাবে!'

হিদারুর হঠাৎ মনে পড়ল উপেনের মুখ। সে মুখ বিকৃত করে ভূষণ সিং-এর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি এখন যাও তো ভূষণ। আমার কাজ আছে।'

কিন্তু সারাটা সকাল আর কাজে মন বসল না হিদারুর। তার বদলে সে মনে মনে উপেনের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগল টাউনের পথে পথে। কল্পনায় দেখল, দেশ স্বাধীন হয়ে গিয়েছে। গান্ধিজি হয়েছেন দেশের বড়োলাট। ইংরেজরা দলে দলে পালাচ্ছে দেশ ছেড়ে। আর সে একটা শংকর মাছের চাবুক জোগাড় করে ছেলেকে বলছে, 'ধুতিখান খুল তো ব্যাটা ভূষণের। অর পাছা আজ লাল করি দিম!'

কিন্তু হায়! ছেলের কথা মনে হতেই চোখে জল চলে এল হিদারুর।

*(ক্রমশ)*

**শুভ্র চট্টোপাধ্যায়**

স্কেচ: দেবরাজ কর

# শ্রীমতীদের দাদাগিরি জারি

শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাবের খ্যাতি দ্রুত ছড়াচ্ছে ডুয়ার্সের সীমানা ছাড়িয়ে কলকাতাতেও। সৌরভ গাঙ্গুলির 'দাদাগিরি' টিভি শোয়ে ডাক পড়েছে শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাবের। সম্প্রতি পাঁচজন শ্রীমতী অডিশন দিয়ে এলেন কলকাতার স্টুডিওতে। এদিকে কোচবিহারে শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাব-এর প্রথম বৈঠক হওয়ার কথা ১৬ জুলাই। তারপরেই লাইনে রয়েছে আলিপুরদুয়ার। তেমনই আপনার এলাকাতে আপনিও খুলতে পারেন শ্রীমতীদের ক্লাব। নিয়মকানুন জানতে যোগাযোগ করুন ইমেল-এ।

আগামী আগস্ট থেকে নভেম্বর শ্রীমতীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বুটিক ও ফোটোগ্রাফি প্রদর্শনী, নাট্য উৎসব, পেইন্টিং ওয়ার্কশপ ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠান। তারপর আগামী ১৮-১৯ নভেম্বর জলপাইগুড়িতে প্রথম বর্ষপূর্তিতে ঘটা করে হচ্ছে শ্রীমতী ডুয়ার্স মেলা। ক্লাব সদস্যদের প্রথম সাধারণ বৈঠক ছাড়াও থাকছে বুটিক ও খাবারের স্টল, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হস্তশিল্প, প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যেই শ্রীমতীদের আয়োজিত মোবাইল ফোটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে, ছবি আসছে প্রচুর। আগামী ২৮-২৯ জুলাই আড্ডাঘর-এ তার মধ্যে থেকেই বাছাই ছবি নিয়ে হচ্ছে প্রদর্শনী। সব মিলিয়ে শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাব-এর অগ্রগতির খবর সত্যি সাড়া জাগাবার মতই।

**নিজস্ব প্রতিনিধি**


## মোবাইল ফোটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা

আপনার মোবাইল হ্যান্ডসেটে তোলা আশপাশের চমৎকার সব মুহূর্তের সেরা পাঁচটি ছবি মেল করুন **klikdooars@yahoo.com** আইডি-তে। অথবা হোয়াটস অ্যাপ্ করুন ৯৮৩১০৭৬৪৬৪ নম্বরে, সঙ্গে নাম ও ফোন নম্বর। সেরা ছবির জন্য থাকবে ৫০০০ টাকা মূল্যের পুরস্কার। বাছাই করা ছবিগুলি নিয়ে হবে প্রদর্শনী ২৮-২৯ জুলাই ২০১৭, জলপাইগুড়ি 'আড্ডাঘর' হলে। তাড়াতাড়ি করুন, ছবি পাঠানোর শেষ তারিখ ২১ জুলাই, ২০১৭।

এখন ডুয়ার্স


# মিষ্টি পটোল

ডুয়ার্সের ডিশ

**শ্রাবণী চক্রবর্তী**

**উপকরণ:** বড় সাইজের পটোল ৫০০ গ্রাম, দুধ ২ লিটার, চিনি ২৫০ গ্রাম, ছোট এলাচ ৫/৬টা, কেওড়ার জল ১ চা চামচ।

**প্রণালী:** প্রথমে দুধ ঘন করে ক্ষীর বানিয়ে নিন। যদি আপনার ক্ষীর বানানোর মতো সময় বা ধৈর্য না থাকে, তবে বাজার থেকে ১০টা ভাল মানের কালাকাঁদ কিনে আনুন ও আধ লিটার দুধের মধ্যে মিষ্টিগুলো ভেঙে দিয়ে শুকিয়ে নিন, ক্ষীর তৈরি হয়ে যাবে। লক্ষ রাখবেন, ক্ষীর যেন পুর ভরবার মতো হয়, অর্থাৎ একদম শক্ত বা পাতলা না হয়।

পটোলগুলোর খোসা পাতলা করে ছুলে ফেলুন এবং গা-টা একটু চিরে নিয়ে ভিতরের বীজটা ফেলে দিন। এবার একটা পাত্রে জল ও দু'মুঠো চিনি দিয়ে জল ফুটতে দিন। ফুটন্ত জলে পটোলগুলো দিয়ে ৩-৪ মিনিট ফুটতে দিন। এবার পটোলগুলো ওই জল থেকে তুলে জলটা ফেলে দিন। এবার আর-একটি পাত্রে আধ লিটার জল ২০০ গ্রাম চিনি দিয়ে গ্যাসে বসান সিরা তৈরির জন্য। সিরা একটু ফুটলে ওতে এলাচের গুঁড়ো দিয়ে কম আঁচে ফুটতে দিন। অন্য দিকে পটোলগুলো ঠান্ডা হলে ক্ষীরের পুর ভরে দিন। পুরটা এমনভাবে ভরবেন, যাতে পটোলের পেটে যতগুলো বীজ ছিল, ততটা পরিমাণ হয়। এর পর সিরা মোটামুটি ঘন হয়ে এলে পটোলগুলো একটা একটা করে ওই সিরার উপর সাজিয়ে দিন ও আরও পাঁচ মিনিট কম আঁচে ফোটান। গ্যাস বন্ধ করবার আগে এক চামচ কেওড়ার জল উপরে ছড়িয়ে দিন। ঠান্ডা হলে দেখবেন, রসটা শুকিয়ে পটোলের সঙ্গে কেমন মাখোমাখো হয়ে যাবে। ২/৩ ঘণ্টা ফ্রিজে রেখে তবে পরিবেশন করবেন। একদম অন্যরকম স্বাদ এই মিষ্টির।

# আন্তর্জাতিক রাগবিতে সরস্বতীপুর চা-বাগানের মেয়েরা

*সরস্বতীপুর চা-বাগানের রাগবি টিমের মেয়েরা*

দীর্ঘদিন ধরেই উত্তরবঙ্গের মুখ্য শিল্প চা-শিল্পের শোচনীয় অবস্থা। বেশ কয়েকটি বাগান যেমন বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে, তেমনই অনেক বাগানের অবস্থা রুগ্‌ণ। এইসব বন্ধ ও রুগ্‌ণ চা-বাগানগুলো থেকে বহু চা শ্রমিক অন্যত্র জীবিকার টানে চলে যাচ্ছেন। মানব পাচারের মতো ঘটনাও ঘটে চলেছে এইসব বাগান থেকে। অনাহারে-অর্ধাহারে থাকা অনেক চা শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। এক কথায়, উত্তরের চা-শিল্পে ভয়ংকর পরিস্থিতি চলছে আজ।

সেখানে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের সরস্বতীপুর চা-বাগান এক আলাদা নজির তৈরি করেছে। জঙ্গল-ঘেরা এক প্রত্যন্ত চা-বাগান এই সরস্বতীপুর। বৃহৎ এলাকা জুড়ে থাকা এই বাগানের জনসংখ্যা প্রায় ছ'হাজার। বাসিন্দাদের সিংহভাগই চা শ্রমিক। বন্য হাতি, চিতা বাঘের হানা প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা। এই আধুনিক যুগে যেমন এখানে যোগাযোগব্যবস্থার অসুবিধা, তেমনই মোবাইলের নেটওয়ার্কও পাওয়া যায় না। কাঁচা এবড়োখেবড়ো পথ পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতে হয়। এমন এক জঙ্গলের প্রত্যন্ত চা-বাগান এলাকার মেয়েরা আজ বিশ্ব দরবারে তাদের নাম তুলতে চলেছে।

জঙ্গল ক্রোস নামে কলকাতার একটি রাগবি ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা পল ওয়ালশের উদ্যোগে ২০১৩ সাল থেকে সরস্বতীপুর চা-বাগানের ছেলেমেয়েদের মধ্যে রাগবি খেলার প্রশিক্ষণ চলছে। তার মধ্যে মেয়েদের একটি দল গত দু'বছর ধরে জাতীয় স্তরে এই খেলায় পশ্চিমবঙ্গের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছে।

জুন মাসেই এখানকার মেয়েরা ওড়িশাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন দলের মধ্যে সন্ধ্যা রাই, সুমন ওরাওঁ, লছমি ওরাওঁ, রিমা ওরাওঁ এবং ঊর্মিলা ওরাওঁদের মতো সাত স্কুলছাত্রী চলতি জুলাইয়ের ৮ ও ৯ তারিখে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে রাগবি বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে জাতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করার ডাক পেয়েছে। এদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন বাগানের কোচ রোশন খাখা।

এই বাগান থেকে জাতীয় দলের হয়ে সুযোগ পাওয়া মেয়েদের মধ্যে রসিতা ও ঊর্মিলার পাসপোর্ট না থাকায় তারা দু'জন প্যারিস যেতে পারছে না। তৎকাল পাসপোর্ট পাওয়ার জন্য ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে তারা। বাকি পাঁচজন গত ১৮ জুন কলকাতায় রওনা দিয়েছে। সেখান থেকে তাদের জঙ্গল ক্রোস রাগবি ক্লাবের পক্ষ থেকে মুম্বই নিয়ে গিয়ে সেখানে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ৫ জুলাই পর্যন্ত মুম্বইয়ে থাকার পর তাদের ফ্রান্সে নিয়ে যাওয়া হয়।

বাগানের কোচ রোশন খাখা বলেন, মেয়েদের অভিভাবকরা দিনপ্রতি মাত্র ১৩২ টাকা মজুরি পেয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। তবুও শত অভাবের মধ্যেও মেয়েদের খেলা তাঁরা বন্ধ করেননি। গরিব বাগান শ্রমিকের মেয়েরা রাগবি খেলায় সুনাম অর্জন করলেও এখনও পর্যন্ত তারা কোনও সরকারি সহায়তা পায়নি। এমনকি কোনও সংবর্ধনাও জোটেনি তাদের কপালে। যা-ই হোক, এ খবর প্রেসে যাওয়া পর্যন্ত ভারতীয় মহিলা হকি দলের সাড়া জাগানো ছবি 'চাক দে ইন্ডিয়া'র নতুন রিপ্লে দেখার অপেক্ষায় আমরা। তবে এবার হকি নয়, রাগবি!

**শুভ্রজিৎ পোদ্দার**

# জল আনে জিভে

২৩ পাতার পর

লাগল শহরের কোণে কোণে। কোনও বিজ্ঞাপন নেই, কোনও জাঁকজমক নেই। পাতলা খোসার ভুসভুসে ব্যাপারটাই নেশাগ্রস্ত করল সাধারণ মানুষকে। পিসি শর্মার মোড়ে সামান্য একফালি জায়গা পেলেন কারও দয়ায়। দুটো বড় বাড়ির মাঝখানে ড্রেনের উপর চার ফুট বাই ছ'ফুট একটা জায়গা, যেখানে একজনই বসে রান্না করতে পারে। আমাদের ছোটবেলায় দেখা সেই কচুরির দোকান যেমন ছিল, আজও তেমনই রয়েছে। না আছে কোনও সাইনবোর্ড, না আছে বিশেষ কোনও নাম। তবে গোত্র পালটেছে। কুলীন হয়েছে এখন।

বিশ্বনাথ রায়ের নাতির সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বিশ্বনাথ বেঁচে নেই এখন। কিন্তু তাঁর চার ছেলে একান্নবর্তী পরিবারে থেকে এই ব্যবসার উপরেই নির্ভর করে আছে। হাসিমুখে বলল বিশ্বনাথের নাতি, 'যা আয় হয়, তাতে আমাদের ভালভাবে চলে যায়।' কচুরির সঙ্গে রয়েছে সন্দেশ আর সকালবেলায় পুরি। তৃতীয় প্রজন্মের দুই ভাই এখন বাবাদের সঙ্গে থেকে থেকে কাজ শিখে নিয়েছে। তারাই এগিয়ে নিয়ে যাবে আগামী দিনে। কৌতূহলবশে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার দাদু যে কচুরি নিজে বানাতেন, তার স্বাদ যা ছিল, তোমাদের হাতেও সেই একই স্বাদ হচ্ছে কী করে? হাসল ও। বলল, 'বানানোটা বাবারা দাদুর সঙ্গে থেকে থেকে শিখে নিয়েছিল, এখন আমরা শিখে নিয়েছি।' শুধু একটা কচুরির দোকান, তা দিয়ে চার চারটি পরিবার জীবনযাপন করে, এ ঘটনা ঐতিহাসিক (?) নয় তো কি?

অতএব জলপাইগুড়িতে বেড়াতে এলে পিসি শর্মার মোড়ে বিশ্বনাথের কচুরির দোকানে একবার ঢুকতেই হবে। হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওখানেই খাবেন, নয়ত প্যাকেটে করে নিয়ে যাবেন পরিবারের সকলের জন্য। অবশ্যই।

জলপাইগুড়িতে তিস্তার পাড় একটা মন ভোলানো বেড়ানোর জায়গা। শুধু বাইরে থেকে কেউ এলেই যে আমরা তাকে বেড়াতে নিয়ে যাই তা নয়, শহরের মানুষ একটু প্রকৃতির স্বাদ পেতে, একটু নৈঃশব্দ্য উপভোগ করতে চলে যায় তিস্তার পাড়ে। তিস্তার বাঁধ যেখানে জুবিলি পার্কে এসে মিশেছে, ঠিক সেখানে শহরের গুরুত্বপূর্ণ অফিসের বেশ কয়েকটি রয়েছে। ডুয়ার্স থেকে বহু মানুষ আসেন কাজের প্রয়োজনে, প্রতিদিন। অফিসের সামনের রাস্তাটা যেখানে বাঁধের উপর উঠে গিয়েছে, ঠিক তার নিচে একটি দুপুরের খাওয়ার হোটেল আছে। নাম 'যাযাবর'। এক পলকে এদিক-ওদিক তাকালে হয়ত বা খুঁজেও পাবেন না। কারণ ওই যে বললাম, ঝাঁ-চকচকে গেট বা রিসেপশন নেই। বরং প্রথম দর্শনে ভক্তি না-ও জাগতে পারে। নিচু ছাদের কাঠের দেওয়াল ঘেরা পাকা মেঝের ঘর একটা। ছোট্ট একফালি দরজা। ছাড়া বাইরে থেকে কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই যে, ভিতরে অত বড় ঘর আর তাতে বেশ কিছু চেয়ার-টেবিল পাতা। সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে রান্না শেষ। বারোটা থেকে শুরু হয়ে যায় ভিড়। এত সুস্বাদু রান্না যে, একবার অন্তত সবাই যাওয়ার কথা ভেবে দেখতে পারেন। প্রতিদিন রান্না হয় ডাল, ভাজা, একটা তরকারি, চিকেন, মাটন এবং মাছ। ভাজা আর তরকারিটা নির্ভর করে বাজারে ওঠা সবজির উপর। অবশ্য মাছটাও তা-ই। বাটা, ট্যাংরা— এসব ছোট মাছের খুব একটা চল নেই। আছে চিতল মাছের পেটি, ইলিশ, চিংড়ি, পাবদা— এইসব মাছ। মানে, পকেটে যাদের জোর আছে, তাদের জন্যই 'যাযাবর'। পকেটের ভাবনা থাকলে খাবার উপভোগ করা যায় না!

ভদ্রলোকের বয়স এখন পঁচানব্বই বছর। এখনও শিরদাঁড়া টানটান রেখে চলাফেরা করেন যে, কে বলবে, উনি নব্বই পেরিয়ে গিয়েছেন। এয়ারফোর্সে চাকরি করতেন। বিলেত, মার্কিন মুলুক, জার্মানি, জাপান, রাশিয়া— কোথায় যাননি চাকরির সুবাদে। অবসর পাওয়ার পর বসে পড়তে মন চায়নি। কী করা যায় ভাবতে ভাবতে হদিশ পান এই জমিটার। এই জমিটা নাকি ছিল ফেকন ঝাঁ নামে এক ভদ্রলোকের। তাঁর কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে জমি কিনে শুরু করলেন ভাতের হোটেল, যা তাঁর মতে ডুয়ার্স-তরাইয়ের বহু ভাতের হোটেলের থেকে আলাদা।

সাধারণ পাইস হোটেল হিসাবে চালানোর কোনও প্ল্যান প্রথম থেকেই ছিল না তাঁর। সবাই জানে, একটু জমিয়ে পেট পুরে ভাত খেতে হলে 'যাযাবর'-এর আজও বিকল্প নেই। যেমন 'যাযাবর' নাম দিয়ে শুরু করলেও এ হোটেল এখন শহরের সবচাইতে পাকাপাকি ঠিকানা!

কী হল? খাওয়া বেশি হয়ে গেল? কোনও চিন্তা নেই, সঠিক তেল-মশলা ব্যবহারে যা রান্না হয়, স্বাস্থ্যের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করে না। তিস্তা নদীর চরে বেড়ান, বাঁধে হাঁটুন, প্রকৃতির হাত ধরুন, মুক্ত বাতাসে দু'দণ্ড জিরিয়ে নিন— দেখবেন, হজম হয়ে গিয়েছে। আবার খিদে পাওয়ার আগেই আজ বিদায় নিই। এর পর জলপাইগুড়ির আরও পুরনো খাবারের দোকানগুলিতে আপনাদের নিয়ে যাব একদিন।

**শ্বেতা সরখেল**

ছবি- অতনু সরখেল

# বর্ষামঙ্গল

রবীন্দ্রনাথের ভাবনায়-লেখায় বরাবর পছন্দের তালিকায় স্থান পেয়েছে বর্ষার মাধুর্যতা। এই বর্ষাকে স্বাগত জানিয়ে রবিবার

জলপাইগুড়ি রাজদিঘি চত্বরে আয়োজিত হয়ে গেল 'বর্ষামঙ্গল' উৎসব। আয়োজক আবর্তন ও মল্লিকা সাংস্কৃতিক সংস্থা। বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এসি কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা রঞ্জনা ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে উৎসবের সূচনা হয়। এরপর বর্ষার গুণগান, নাচ, গান, কবিতার সমাহারে জমে ওঠে উৎসব প্রাঙ্গন। নৃত্য পরিবেশন করেন প্রবৃত নন্দী, শুভ্রজিৎ ভৌমিক, সাম্যব্রত সরকার, সঞ্চিতা রায়, মধুমিতা রায়, পিকি ঘোষ, প্রভাকর বকসি, রিসা চক্রবর্তী, রূপসা চক্রবর্তী, দীপা সরকার, অনুলীপি মৌলিক, সৈকত দে, স্বাগতম দে, প্রিস্মিতা রায়, দীব্যার্নঁনো দে, রিমি সেন, দিৎসা সেন। গান গাইলেন স্নেহা চক্রবর্তী, সায়নী সরকার, নিন্নি ভৌমিক। কবিতায় ছিলেন মৌসুমী চক্রবর্তী, প্রত্যুষা ভট্টাচার্য, মৌর্য সরকার, দেবাত্রিক চক্রবর্তী। বর্ষামঙ্গল উৎসবের মধ্য দিয়ে বৃক্ষচারা রোপণ করে সবুজায়নের বার্তাও তুলে ধরা হয়। এদিন প্রচুর মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন রাজদিঘি চত্বরে। **নিজস্ব প্রতিনিধি**

অরণ্য মিত্র

পরিকল্পনামাফিক দীননাথের রিসর্টে রাত কাটাবার ছলে রওনা দিল দেবমালা যাদব। জায়গা মিলবে কি না ঘোর সন্দেহ। পাওয়া গেলে কাজটা আরও বিপজ্জনক হবে। নদী পেরিয়ে তিনজন কিন্তু চলে এসেছে রিসর্টের কাছাকাছি। কিন্তু বোসবাবু বিপক্ষের নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে ঠিকমতো না জেনে পা ফেলবেন না। তবে রিসর্টে থাকতে দেওয়ার ব্যাপারে অপ্রত্যাশিত সাড়া পেল দেবমালা। সে কি কোনও ফাঁদের দিকে যাচ্ছে? এম সিক্সটিন এ ফোর রাইফেলের ট্রিগার চাপতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল কেন র‍্যান্টি? মেগাসিরিয়াল এখন মেগা ক্লাইম্যাক্সে!

১০৬

আকাশে চমৎকার চাঁদ। গাছপালায় ঘেরা রাস্তা ধরে গাড়ি চালাচ্ছিল দেবমালা। ড্যাশ বোর্ডের ঘড়ি বলছে আটটা চল্লিশ। দু'ধারে গাছের সারি ঘন হতে শুরু করেছে। দীননাথের রিসর্টের দিকে বাঁক নেওয়া রাস্তার মোড়টা সামনে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। দেবমালা গাড়ির গতি কমাল। বাঁকের মুখে একটা পেল্লায় গাছ। তার পাশ দিয়ে রিসর্টের দিকে চলে যাওয়া রাস্তাটা চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে। সাবধানে গাড়ি ঘোরাল দেবমালা। রাস্তাটা চওড়া নয়। দু'পাশের জঙ্গলে জমে থাকা কঠিন অন্ধকার হেডলাইটে গলে গেল কিছুটা। আচমকা ইঞ্জিনের শব্দ পেয়ে ডাকতে থাকা ঝিঁঝিগুলো থমকে গেল কয়েক সেকেন্ডের জন্য। তারপর আবার শুরু করল দ্বিগুণ উৎসাহে। রাতের বেলা এ রাস্তা বেশ বিপজ্জনক, কারণ এটা হাতিদের করিডর। দেবমালা রাস্তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গাড়ির গতি কুড়ি-পঁচিশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সাবধানে চালাচ্ছিল। মনের উত্তেজনা দমিয়ে রেখে নিজেকে শান্ত রাখতে চাইছিল যথাসম্ভব।

মিনিটকয়েক চলার পর ডান দিকের জঙ্গল হালকা হয়ে গেল কিছুটা। জমি একটু উঁচু হয়ে সামনে অন্ধকারে মিশে গিয়েছে। আরও একটু এগতেই রিসর্টের গেটটা নজরে পড়ল তার। দেবমালার মনে হল যে, জঙ্গল কেটে জমি বার করে বসানো হয়েছে রিসর্টটা। এমন করা মোটেই আইনসম্মত নয়। কিন্তু ডুয়ার্সে এমন উদাহরণের অভাব নেই।

গেটের আগে খানিকটা ফাঁকা জমি। রাস্তাটা বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে রিসর্টের সীমানা বরাবর সম্ভবত নদীর দিকে চলে গিয়েছে। গেটের দু'পাশে দুটো ছোট স্তম্ভে আলো জ্বলছিল। দেবমালা গাড়ি থামাল। তারপরে তার নজরে এল যে, গেটের দুটো পাল্লার একটা খানিকটা খোলা রয়েছে। সেই ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে ভিতরের পাথর বিছানো সরু পথের খানিকটা। সে পথের ধারেও সম্ভবত আলো জ্বলছিল। তাহলে কি রিসর্টের লোকজন জেগে আছে? অবশ্য রাত এমন কিছু হয়নি। তার উপরে আকাশে এমন সুন্দর চাঁদ। অপরাধীদের প্রকৃতি থাকবে না— এমন কোনও নিয়ম নেই।

গাড়ির ইঞ্জিন চালু রেখে দেবমালা মিনিটখানেক অপেক্ষা করল। তারপর হর্ন বাজাল দু'বার। কাজটা অন্যায় হচ্ছে। জঙ্গলের মধ্যে রাতের বেলা হর্ন বাজানো নিষিদ্ধ। কিন্তু এটা ছাড়া রিসর্টের ভিতরে থাকা লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণের আর কোনও উপায় দেবমালার মাথায় এল না। হর্ন বাজিয়ে আরও মিনিটখানেক অপেক্ষা করার পর দেবমালা যখন আবার হর্নের সুইচে হাত রাখতে যাবে, তখনই গেটের ফাঁক দিয়ে একজনকে দেখা গেল এগিয়ে আসতে। সাধারণ প্যান্ট-শার্ট পরা লোকটি যে একজন প্রৌঢ়, সেটা বোঝা গেল তিনি গেটের বাইরে আসতে।

'কী ব্যাপার?'

একটু বিরক্তি মেশানো গলা শুনল দেবমালা। সে গাড়ি থেকে নামল।

'রাতে হর্ন বাজাচ্ছেন কেন? এই রিসর্ট পুরো বুকড।' লোকটি দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয় যে, গাড়ি থেকে একজন মহিলা নেমেছেন।

'আসলে আমি কোথাও ফাঁকা পেলাম না।' দেবমালা গলার স্বরে অসহায় ভাব ফুটিয়ে বলল, 'ওদিক থেকে বলল যে, এখানে রুম পাওয়া যেতে পারে।'

'আপনি একা এসেছেন?' গলার আওয়াজে এবার একটু বিস্ময় ফুটিয়ে লোকটি দু'পা এগিয়ে এল— 'এদিকে এসেছেন অথচ কোনও থাকার জায়গা আগাম বুক করেননি? হঠাৎ চলে এসেছেন নাকি?'

'ভাবিনি জায়গা পাব না। প্লিজ যদি একটা রুমের ব্যবস্থা করে দেন। আপনি কি ম্যানেজার?'

'না। ম্যানেজার কাল সকালের আগে আর আসবেন না।'

'আপনাদের কি সব রুম লাগবে?' দেবমালা আরও অসহায় গলায় জানতে চায়।

লোকটি কয়েক সেকেন্ড চুপ করে কী জানি ভাবে। তারপর বলে, 'সব রুম আমাদের লাগেনি। আপনাকে একটা দেওয়া যেতেই পারে। ম্যানেজার না থাকলেও পুরো রিসর্ট যখন আমরা বুক করেছি, তখন একজনকে রাতে থাকতে দিলে বেআইনি কিছু হবে না। গাড়িটা ঢুকিয়ে দিন।'

'থ্যাঙ্কিউ স্যার!' কৃতজ্ঞতায় যেন গলে গেল দেবমালা। লোকটি সামান্য হেসে গেটের আধখোলা পাল্লাটা পুরো খুলে দিতেই গাড়ি ঢোকার মতো যথেষ্ট জায়গা হয়ে গেল।

'ঢুকেই বাঁ দিকে রাখুন গাড়িটা।'

লোকটি নির্দেশ দিল। গাড়ি পার্ক করাতে গিয়ে দেবমালার নজরে পড়ল, আরও তিনটে গাড়ি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। সরু পাথর বিছানো পথটা খানিকটা এগিয়ে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে দু'দিকে চলে গিয়েছে। বাঁ পাশের রাস্তাটার সমান্তরালে কয়েকটা ছোট ছোট বাড়ি। ডান দিকে কিছুটা খোলা জমি পেরিয়ে একটা বাংলো। ছোট ঘরগুলোয় আলো জ্বলছিল। বাংলোর সামনেও একটা অপেক্ষাকৃত জোরালো আলো উঁচু পোস্টের উপরে লাগানো। এই আলোটার কারণেই রিসর্টের পরিবেশটা বোঝা যাচ্ছিল মোটামুটি।

'আপনারা কি টুরিস্ট?' দেবমালা হাতব্যাগে গাড়ির চাবিটা ঢুকিয়ে জিজ্ঞেস করল। পরক্ষণেই তার মনে হল, পিছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। সে দ্রুত ঘাড় ঘোরাতে চাইছিল, কিন্তু ততক্ষণে একটা ঠান্ডা স্পর্শ এসে লেগেছে তার কানের নিচে। স্পর্শটা ধাতব।

'একদম নড়বেন না ম্যাডাম!' লোকটির মুখে ফুটে উঠল ক্রূর হাসি— 'গুলির শব্দ হলে এখানে কোনও সমস্যা নেই। আমি টুরিস্ট টিমের ক্যাপটেন। আমাকে সবাই দাসবাবু নামে জানে।' ছোঁ মেরে দেবমালার হাত থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে বলল সে। ব্যাগে রিভলভার আছে, সেটা আবিষ্কার করে তৃপ্তির হাসি হাসলেন দাসবাবু।

১০৭

নদীতে জল বিশেষ ছিল না। ওদের তিনজনের জুতো ভিজল কেবল। পাড়টা ফুট তিনেক উঁচুতে। তারপর ফাঁকা জমি আরও একটু উঁচু হয়ে রিসর্টের পিছনের জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ওরা যে রেখাটা ধরে এগচ্ছিল, সেটা ঠিক রিসর্টের পিছন দিকে যাচ্ছিল না— বরং সেটাকে অন্তত একশো ফুট ডান দিকে রেখে ওদের একটা ঢিপির আড়ালে থাকতে সাহায্য করছিল। রিসর্টের পিছন দিকে পাহারা থাকলে তার নজর এড়ানোর জন্যই এভাবে এগচ্ছিল ওরা। ঢিপিটা প্রায় দশ ফুট উঁচু। পাড় ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে।

তিনজনের একজন বয়স্ক। তাঁকে আমরা বোসবাবু বলে জানি। তাঁর গলায় একটা ব্যাগ ঝুলছে। বাকি দু'জনের একজনের হাতে নবীন রাইয়ের কাছ থেকে পাওয়া অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় রাইফেলটি, যা মিনিটে আটশো বুলেট ছুড়ে দিতে পারে। ঢিপির কাছটায় এসে তিনজনই দাঁড়িয়ে পড়ল। বোসবাবু গলায় ঝোলানো ব্যাগ থেকে একটা বাইনোকুলার বার করে ঢিপিটার গা বেয়ে উঠলেন। বোঝা গেল যে, বয়স হলেও তিনি ভালই ফিট রয়েছেন। বাইনোকুলারটি দিয়ে সহজেই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা সম্ভব। রিসর্টের পিছন দিকটা বেশ কয়েক মিনিট ধরে পর্যবেক্ষণ করার পর নেমে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'দু'জন আছে। আর্মড।'

রাইফেল হাতে লোকটা এবার ঢিপি বেয়ে উঠল। রাইফেলের ভিউফাইন্ডার ইনফ্রা রেড আলোযুক্ত। সেটা চোখে লাগিয়ে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করার পর নেমে এসে বলল, 'আমরা এদিক দিয়ে অনায়াসে এগিয়ে যেতে পারি। ওদের পক্ষে এতটা দূর থেকে আমাদের দেখে ফেলাটা অসম্ভব। মনে হয় না ওদের কাছে রাতে দেখার জিনিস আছে।'

'টার্গেট নিশ্চয়ই রিসর্টের ভিতরে কোথাও থাকবে।' তৃতীয়জন এবার বলল, 'রিসর্টের ভিতরেও কি পাহারা আছে?'

'সেটা সেদিকে আরেকটু না এগলে বোঝা যাবে না।' বোসবাবু জানালেন। তারপর তৃতীয় ব্যক্তির দিকে বাইনোকুলারটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি খানিকটা ভিতরে গিয়ে দেখে এসো। তবে একদম ঝুঁকি নেবে না। আমাদের আগে জায়গাটা বুঝতে হবে।'

তৃতীয় ব্যক্তির নাম মালিক। সে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢিপির পাশ দিয়ে নিজেকে যথাসম্ভব গাছপালার আড়ালে রেখে মিশে গেল অন্ধকারে। আকাশে হালকা এক টুকরো মেঘ তখন চাঁদের আলোকে কিঞ্চিৎ মলিন করে ফেলেছে। প্রায় তিরিশ মিটার হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মালিক রিসর্টের সীমানা প্রাচীরটা পেল। সেটা অবশ্য নদীর পাড়ের কাছাকাছি এসে ফুরিয়ে গিয়েছে। সে বুঝল যে, পিছনে নদীর দিকে রিসর্টের কোনও প্রাচীর নেই। তার বদলে ছোট ছোট খুঁটি আর দু'সারি তার দিয়ে সেদিকটা আটকানো। সব মিলিয়ে ফুট তিনেক উঁচু হবে। তারের ফাঁক দিয়ে অনায়াসে ঢুকে যাওয়া সম্ভব। সম্ভবত রিসর্টের পিছনের বাগানে বসে নদীর শোভা দেখতে সুবিধা হবে ভেবেই সেদিকে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়নি।

প্রাচীরের উচ্চতা ফুট পাঁচেক। মালিকের আড়াল নিতে সুবিধে হল। দেয়াল বরাবর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ঝুলে থাকা ডালপালা আর পাতার ফাঁক দিয়ে সে চোখ রাখল ভিতরের দিকে। সামনের দিকে প্রায় ষাট ফুট দূরে বাংলো টাইপের একটা বাড়ি। সে বাড়ির সামনের দিকে সম্ভবত জোরালো কোনও আলো আছে। ফলে বাইনোকুলার ছাড়াই ভিতরটা দেখতে খুব একটা সমস্যা হচ্ছিল না মালিকের। উলটো দিকে কয়েকটা ছোট বাড়ি পরপর। বাড়িগুলোর ভিতরে আলো জ্বলছে। মাঝখানে পাথরের রাস্তা, এলোমেলো কিছু গাছ, ফুলগাছের কেয়ারি করা এলাকা, সিমেন্টের বেঞ্চি, ঘাসজমি।

মালিক আরও খানিকটা এগিয়ে গেল। এবার বাংলোর পিছনের একটা ঘরের জানলা খোলা দেখল সে। ভিতরে আলো জ্বলছে। বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে মালিক ঘরের ভিতরে থাকা ব্যক্তিটিকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করতে পারল অনায়াসে। ব্যক্তিটি একজন সাধারণ চেহারার মহিলা। দাসবাবু কি এই বাংলোতেই আছে? নাকি ওই ছোট বাড়িগুলোর একটায়?

দেয়ালের এপাশ থেকে বাংলোটা অতিক্রম করে রিসর্টের সামনের ফাঁকা মাঠটায় চোখ রেখে মালিক বুঝল, গেটে কোনও পাহারা নেই। গোটা তিনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে পিছন দিকের দু'জন পাহারাদার ছাড়া বাকি রিসর্টে নিরাপত্তার জন্য আর কাউকে রাখা হয়নি। এটাই স্বাভাবিক। কারণ পিছনে কোনও প্রাচীর নেই। মনে হয়, রিসর্টের লোকেরা শত্রুপক্ষের আক্রমণের কোনও সম্ভাবনাই

> র‍্যান্টি ঝোপের ধার ঘেঁষে হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর রাইফেল তাক করল ওদের দিকে। দু'সেকেন্ড ট্রিগার চেপে রাখলেই ডজন দুয়েক বুলেট ছুটে যাবে ওদের দিকে। গুলির শব্দ কানে ঢোকার আগেই মরে যাবে। 'মারছি!' ফিসফিস করে বলল র‍্যান্টি।

টের পায়নি। দুটো পাহারাদার রেখেই নিশ্চিত হয়েছে তারা।

পরিস্থিতি দ্রুত অনুধাবন করে মালিক এবার টিপির দিকে ফিরতে লাগল। বোসবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ক'জন আছে পাহারায়?'

'ওই দু'জনই।' মালিক বাইনোকুলার ফেরত দিয়ে পকেট থেকে গ্লকটা বার করল এবার— 'ওই দুটোকে নামিয়ে দিই আগে। গুলির আওয়াজ পেলে নিশ্চয়ই রিসর্টের ঘর থেকে ওরা বেরিয়ে আসবে। টার্গেট বার হলেই র‍্যান্টি ফায়ারিং শুরু করবে। টার্গেট পড়ে গেলেই আমরা পিছিয়ে যেতে শুরু করব। মনে হয় না নদী পেরিয়ে ওরা আমাদের ধাওয়া করার সাহস পাবে।'

'গ্রেট!' বোসবাবু প্রশংসার সুরে বললেন, 'র‍্যান্টি অনেকক্ষণ ধরে এম সিক্সটিনটা ক্যারি করছে। দাসবাবুর সঙ্গে কেউ বেরিয়ে এলে তার কপালে দুঃখ আছে, তা-ই না র‍্যান্টি?'

'মনে হয় না আমাদের ধাওয়া করার জন্য কেউ বেঁচে থাকবে!' র‍্যান্টি হাসল।

'গুড!' বোসবাবু বাইনোকুলার চোখে লাগালেন। তারপর বললেন, 'মুভ!'

র‍্যান্টিকে সামনে রেখে তিনজন সন্তর্পণে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা পাহারাদার দুটোর দিকে এগোতে শুরু করল। লোক দুটোর হাতে ইনস্যাস রয়েছে। কিন্তু তার পাল্লার বাইরে থেকেই এম সিক্সটিন ফোর এ অটোমেটিক রাইফেল দিয়ে ওদের শুইয়ে দেওয়া সম্ভব। এ ক্ষেত্রে দরকার শুধু ভাল একটা পজিশন। র‍্যান্টি ভিউফাইন্ডারে চোখ রেখে সেটা খুঁজে যাচ্ছিল। পাহারাদার দুটো অবশ্য নদীর দিক থেকে মুখ ঘোরাচ্ছিল না খুব একটা। ওরা তিনজন একটা বড় ঝোপের পিছনে এসে নিঃশব্দে দাঁড়াল। দুই পাহারাদার এবার ওদের সোজাসুজি প্রায় পঞ্চাশ মিটার দূরে। র‍্যান্টি ঝোপের ধার ঘেঁষে হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর রাইফেল তাক করল ওদের দিকে। দু'সেকেন্ড ট্রিগার চেপে রাখলেই ডজন দুয়েক বুলেট ছুটে যাবে ওদের দিকে। গুলির শব্দ কানে ঢোকার আগেই মরে যাবে।

'মারছি!' ফিসফিস করে বলল র‍্যান্টি। তারপর ডান হাতের তর্জনীটা ছোঁয়াল ট্রিগারে, কিন্তু চাপল না। কারণ বাতাসে ভর করে তাদের কানে আচমকা ভেসে এল গাড়ির হর্নের শব্দ। পরপর দু'বার।

'রিসর্টে কোনও গাড়ি আসছে! ডোন্ট শুট!' বললেন বোসবাবু। ওরা নিজেদের ঢেকে ফেলল ঝোপের আড়ালে।

১০৮

গাড়ির হর্নের শব্দ পেয়ে বাকিরা এর মধ্যে বেরিয়ে এসেছে। বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুক্লা দাস কৌতূহলী চোখে দেখলেন, একটি মেয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসছে বাংলোর দিকে। তার পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে হাঁটছে সুরেশ কুমার। পাশে দাসবাবু। তাঁর হাতে একটা লেডিজ ব্যাগ। ক্ষণিকের মধ্যে শুক্লা দাস বুঝে গেলেন, কোনও গন্ডগোল হয়েছে। অচেনা মেয়েটির বয়স বেশি নয়। কালো টি-শার্ট আর প্যান্ট পরা। গুপ্তচর নাকি?

'আপনাদের কোথাও ভুল হচ্ছে।' মেয়েটির গলা শোনা গেল, 'আমি অ্যাডভেঞ্চার টুরিজম ভালবাসি। একা ঘুরে বেড়াই বলে সঙ্গে পিস্তল রাখি।'

দাসবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেবমালার চোখের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললেন, 'তা-ই?'

'বিলিভ মি!'

'এই এলাকায় সব রিসর্টে একটা-দুটো রুম ফাঁকা আছে ম্যাডাম! আমরা জানি। আপনি চাইলেই থাকতে পারতেন।'

'এই রিসর্টের পরিবেশটা আমার পছন্দ।' দেবমালা মাথা নিচু করে বলল, 'তাই মিথ্যে বলেছিলাম যে রুম পাইনি।'

'গুড।' দাসবাবুর মুখ গম্ভীর হল। শুক্লা দাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মেয়েটাকে কী বুঝছ?'

'রাজা রায়ের হাতে সাইরে দ্যান।' শুক্লা দাসের চোখ সরু হয়ে গেল— 'এখানে তো সবি তোলার লোক আসে। একটা অরিজিনাল রেপের ভিডিয়ো পাইলে ভাল দরে বেচা যাবে।'

দাসবাবু একটু হেসে বললেন, 'রাজাকে ডাকো। ব্যাটা ঘুমাচ্ছে। কিন্তু দিদিমণির মোবাইলটা কোথায়? সার্চ করো তো।'

মোবাইল দেবমালার প্যান্টের পকেটে। সুরেশ কুমার অবশ্য সার্চ করার আদেশ পেয়ে এক সেকেন্ডও দেরি করেনি। পিস্তল ধরা হাতে পিছন থেকে দেবমালার গলাটা জড়িয়ে ধরে অন্য হাতটাকে কাজে লাগাতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু প্যান্টের পকেট অবধি যাওয়ার আগে সে হাতে দেবমালার বুকে আর পেটে বেশ কয়েকবার ওঠানামা করল। অস্বস্তি আর অপমান ভুলে থাকার জন্য উপস্থিত মানুষগুলোকে দেখতে থাকল সে। ছোট বাড়িগুলোর দিক থেকে এগিয়ে আসা দু'জনের একজন তার বয়সি একটি মেয়ে। কিন্তু তার চোখ-মুখে প্রবল বিস্ময় লক্ষ করে দেবমালা বুঝল যে, সে এসব ব্যাপারে অভ্যস্ত নয়। তার সঙ্গে থাকা সুন্দর চেহারার যুবকটিকেও বেশ বিস্মিত দেখাচ্ছিল।

অবশেষে মোবাইলটা বার করে দাসবাবুর দিকে ছুড়ে দিল সুরেশ কুমার।

'এবার আপনাকে রাজা রায় একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে জেরা করবে। মুখ খুললে বেশি চটকাবে না। না খুললে কাল সকালে আপনি বাড়ি যেতে পারবেন কি না, সেটা নির্ভর করছে রাজাকে গোটা রাতটা কতটা সামলাতে পারবেন, তার উপর।'

'কেন এইরকম করছেন আপনারা?' করুণ গলায়, মুখে যতটা সম্ভব অসহায়তার ভান করে বলল দেবমালা।

দাসবাবু নিশ্চয়ই জবাব দিতেন দেবমালার প্রশ্নের, কিন্তু তখনই সুরেশ কুমারের মোবাইল বেজে উঠল। বিরক্ত আর কৌতূহল মেশানো মুখে ফোনটা হাতে নিয়ে দীননাথ চৌহানের নাম দেখল সে। খানিকটা অবাক হয়ে ফোনটা ধরে বলল, 'কী ব্যাপার?'

'থ্রি পিপল সার!' দীননাথের উত্তেজিত গলা শোনা গেল, 'ক্রসিং রিভার এন্ড রিসর্টের দিকে ঘুসে গেল মালুম হচ্চে। আই ট্রায়িং ইউ ফোন মেনি মিনিট। লেকিন সিগনাল নট কানেকশন—।'

আর শুনল না সুরেশ কুমার। দাসবাবুর কৌতূহলী চোখের দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় বলল, 'দীননাথের ফোন। তিনজন লোককে ও নদী পেরিয়ে এদিকে আসতে দেখেছে!'

'হোয়াট!' দাসবাবু চমকে উঠলেন। তারপর পিছনের জঙ্গলের দিকে ছুটে গিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'কেউ নদী পেরিয়ে ঢুকেছে। সার্চ! সার্চ!' চিৎকার শুনে টর্চ জ্বালাল পাহারাদার দুটোর একজন। সঙ্গে সঙ্গে এম সিক্সটিন ফোর এ রাইফেলের গুলির শব্দে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল চারদিকের নীরবতা, গাছের পাতা এবং পাহারাদার দুটোর শরীর। তারপর সব চুপ।

দাসবাবু ততক্ষণে বাংলোর বারান্দার কাছে এসে পজিশন নিয়ে ফেলেছেন। সুরেশ কুমারও দৌড়েছে সেদিকে। আর আতঙ্কে মায়াঙ্ককে জড়িয়ে ধরে থরথর করে কাঁপছে মনামি।

'আড়ালে যাও!' দাসবাবু চিৎকার করলেন। মায়াঙ্ক সংবিৎ ফিরে পেয়ে এক ধাক্কায় মনামিকে একটা বেঞ্চির পিছনে ফেলে দিয়ে নিজেও আড়াল নিল সেখানে। বুলেটের পরের ঝাঁকটা ছুটে এল তখনই।

'রাজার ব্যাগে স্মোক বম্ব আছে। জলদি!'

কথাটা বলে দাসবাবু তাঁর অটোমেটিক পিস্তল নিয়ে বারান্দার কোনার দিকে সরে গিয়ে পরপর গুলি ছুড়লেন পিছনের জঙ্গলের দিকে। সেদিক থেকে কেউ ভিতরের দিকে আসার চেষ্টা করলে নিশ্চিতভাবে বারান্দাটার সামনের দিকে আসবে। সে ক্ষেত্রে দুটো গ্লকের মুখোমুখি হতে হবে তাদের। সেটা বোসবাবুও বুঝতে পেরেছেন। তাই তিনি খামকা গুলি খরচ না করার নির্দেশ দিয়ে চোখে বাইনোকুলার লাগালেন। গাছপালা-ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে অনায়াসে দূরের ছোট বাড়িগুলোর দিকে যাওয়া সম্ভব। সেখানে পৌঁছাতে পারলে বাংলোর বারান্দায় থাকা দাসকে পেড়ে ফেলতে সময় লাগবে না। তাঁর গলা কানে এসেছে বোসবাবুর। টার্গেট খুঁজে পেয়েছেন তিনি।

*(ক্রমশ)*

ডুয়ার্স থেকে শুরু

# আয় তবে সহকারী...

বাঁশের চেয়েও কঞ্চি দড়? ডিম আগে, না মুরগি আগে? স্টুডিয়োপাড়ার ফ্লোরে 'অ্যাকশন' এবং 'কাট' বলবার অধিকার একমাত্র ডিরেক্টর সাহেবের। কিন্তু ক্যামেরা রোল হওয়ার নেপথ্যে হাজারটা ঝুটঝামেলা ম্যানেজের আসল জাদুকর হলেন হিসেবি প্রধান সহপরিচালকমশাই। কখনও কখনও ডিরেক্টর হয়ে যান রাষ্ট্রপতি আর চিফ এডি প্রধানমন্ত্রী! অর্থাৎ দরকার পড়লে অনভিজ্ঞ ডিরেক্টরকে তিনি অনায়াসে 'স্পিকটি নট' করে সাইডলাইনে বসিয়ে দিতে পারেন। সেই সংঘাতে সৃষ্ট মান-অভিমানের বিচিত্র পালাগান আস্বাদ করুন এই পর্বে!

শিববাড়ির মাঠ। একসময় ছিল। এখন, সময়ের গর্ভে বিলীন। সোনাউল্লা স্কুলের পিছনে অবস্থিত শিব মন্দিরটির কারণেই মাঠের ওই নাম। শিব মন্দিরের সামনে একটি মোটামুটি চৌকো আকারের নিরিবিলি পুকুর পেরিয়ে এলেই শুরু হত নিচু জমির মাঠখানা। যে মাঠ পেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে স্কুলে আসত ওপাশের পাড়ার প্রচুর ছেলে। শিব মন্দিরের আঙিনা এবং স্কুল কম্পাউন্ডের মাঝে এক মানুষ উঁচু টিনের পাঁচিলটির এক জায়গায় চৌকো জানালার মতো একটি খোপ ছিল। অধিকাংশ ছেলেই সেটির ফাঁক গলে স্কুলে যাওয়া-আসা করত।

একসময় স্কুলবাড়ি আর শিব মন্দিরের খাঁজে ল কলেজের বিল্ডিং গড়ে উঠল। মন্দিরের পুকুরটা হয়ে গেল সাঁতার শেখার সুইমিং পুল। আর ওপাশে শিববাড়ির মাঠে টপাটপ একের পর এক বাড়ি উঠে— পুরো মাঠখানাই একদিন গায়েব হয়ে গেল।

বোধহয় ১৯৮২ কি '৮৩ সাল হবে। শীতের মরশুমে সেই মাঠে একবার টানা সাত দিন ধরে লাগাতার যাত্রাপালা চলেছিল। গোটা জলপাইগুড়ি শহরে আলোড়ন তোলা সে এক বিপুল যাত্রা উৎসব। ক্লাস সিক্সের বয়সে, জীবনে সেই প্রথম আমার পরপর সাত রাত জাগা। নবাব সিরাজউদ্দৌলা, নটী বিনোদিনী থেকে শুরু করে সামাজিক পালা এবং আধুনিক প্রেমের পালা পর্যন্ত, সে এক সাতরাঙা রামধনুর ইমোশন এবং ইমেজারিতে আকণ্ঠ অবগাহন। সারা বছরে তখন একবার বড়জোর সিনেমা হলে আমাদের তীর্থযাত্রার আবেদন মঞ্জুর হত। এহেন পরিস্থিতিতে ওই সাত দিন, বলতে গেলে রুশ বিপ্লবের চেয়েও বেশি বিস্ফোরক!

যত দূর মনে পড়ছে, আকারে অন্তত দেড়খানা টাউন ক্লাব ময়দানের সমান হবে শিববাড়ির মাঠ। আর তাতে, ফুল টাউন ক্লাব ময়দানের সমান আয়তন জায়গা জুড়ে বাঁশের খাঁচা বাঁধা হয়েছিল। চারপাশে **ধারার** বেড়ার পাঁচিল। মাথার উপরটায় ত্রিপলের

ছাউনি। সে আঙিনার ভিতরে চতুর্দিকে পুরু খড়ের গদিতে দর্শকাসন। আর একদম মধ্যিখানে পেল্লায় স্টেজ।

সকালের দিকে পুরো চত্বরটাই একেবারে ভোঁ ভাঁ ফাঁকা। বাড়ির একেবারে কাছে বলে ওই মাঠের সঙ্গে আমাদের বারো মাসের আত্মীয়তা। গ্রীষ্ম আর শীতের মরশুমে ওই মাঠে ফুটবল বা ক্রিকেট খেলি আমরা সবুজ সংঘর সদস্যগণ। আর বর্ষার সময় গোটা মাঠ যখন এক হাঁটু জলের নিচে, তখন মাঠের ধারের উঁচু রাস্তায় ছিপ নিয়ে মাছ শিকারিদের বিরাট লাইন। সুতরাং মাঠের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের চরিত্রই আমাদের কাছে খুব চেনা।

অথচ, দিনের বেলায় প্রহরীহীন গেট ঠেলে ফাঁকা যাত্রা আসরে ঢুকে মনে হত যেন কয়েক আলোকবর্ষ দূরের সম্পূর্ণ অন্য একটা জগৎ। যেটাকে বলে, দ্য পাওয়ার অব এন্টারটেইনমেন্ট মিডিয়া— সেই প্রথম বোধহয় ওই বিমূর্ত শক্তির আঁচকে অনুভব করেছিলাম— একেবারেই অজান্তে। শূন্য আসরের এক কোণে স্তূপ হয়ে থাকা খড়ের গাদায় শুয়ে শুয়ে তাকিয়ে দেখছি অনেক দূরের ফাঁকা মঞ্চটা। উপরের ত্রিপলের ছাউনি ভেদ করে ভিতরে আসছে খানিকটা অস্বচ্ছ রোদ। বাঁশ, কাঠ, **ধারার** বেড়া আর খড়ের গাদা দিয়ে তৈরি ওই জগৎটাকে এক আশ্চর্য সোনালি আভায় ভরিয়ে দিয়েছে সেই অলৌকিক আলো। আমার কিশোর মনের কাছে সবটাই এক বিস্ময়। যেমন ওই শূন্য প্রাঙ্গণও বাঙ্ময়, তেমনই রাতের চোখ ধাঁধানো আলো, কনসার্ট, অর্কেস্ট্রা এবং পূর্ণ দর্শকাসনের কলরোলও। সেই কবেকার ওই মত্ততা ভাইরাস হয়ে ঢুকে পড়ে চেতনায় বাসা বেঁধে ফেলেছে। সাফল্য বা ব্যর্থতা— কিছুতেই তার চিকিৎসা নেই আজও!

‘কখঅ-কখঅ!’

কাকের কর্কশ ডাকে ঘোরটা কেটে গেল। তাকিয়ে দেখি, এগারোখানা কাক চারপাশের কার্নিশ, পাঁচিল আর গাছে সতর্ক ফিল্ডারের মতো তাক করে বসে রয়েছে। পেল্লায় দোতলা বাড়িটির সামনের শান বাঁধানো উঠোনে আজ লাঞ্চ চলছে। আমাদের শুটিং পার্টির সংবাদ পেয়ে সমবেত হওয়া কাকগুলোর দলপতি আর ধৈর্য বজায় রাখতে না পেরে এতক্ষণে মুখ খুলল। বোধহয় বলতে চায়, কখন? কখন? আমাদের ভাগটা জুটবে কখন?

সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের পাশে হিন্দুস্থান পার্কের এই বনেদি দোতলা বাড়িটিকে প্রোডাকশন ম্যানেজাররা নাম দিয়েছে ‘জ্যোতি বসুর ভাইয়ের বাড়ি’। কোনও একসময় তাঁদের পরিবার এখানে বাস করতেন। এখন শুটিংয়ের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। আজ সকাল থেকে এখানে ঘাঁটি গেড়েছে আমাদের ইউনিট। আর শুটিং-এ উপস্থিত রয়েছেন বাংলা সিনেমার দুই অসাধারণ প্রবীণ তারকা। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে। টেবিল ছেড়ে উঠে কলতলায় কুলকুচি করছি। এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে ধূমকেতুর বেগে ছুটে বেরিয়ে এল প্রোডাকশন ম্যানেজার তিলকদা। তিলকদার হাড়সম্বল চূড়ান্ত রোগা মুখে দুটো জিনিস সবার প্রথমে চোখে পড়বে। এক, সরু গোঁফের নিচে খরগোশের দাঁতের মতো বেরিয়ে আসা সামনের দাঁতের পাটি। আর দুই, পেল্লায় ফ্রেমের হাই পাওয়ার চশমার পিছনের চোখ দুটো। যুগপৎ উত্তেজনা এবং টেনশনে সেই চোখ এখন প্রায় কাচ ভেদ করে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। হাঁপাতে হাঁপাতে কোনওক্রমে আমার সামনে এসে তিলকদা বলল, সর্বনাশ! আবার লেগে গিয়েছে গো!

—আবার!

আমি চমকে উঠলাম। কলের জল ছিটকে এসে সেই ফাঁকে যত্ন করে আমার জামার সামনেটা ভিজিয়ে দিল। কিন্তু তাকে পাত্তা দেওয়ার মতো মনের অবস্থা নেই তখন। নিজে ঘড়ি ব্যবহার করি না। তাই তিলকদার হাতটা টেনে ধরে সময় দেখলাম ঘড়িতে। শিফ্‌ট শেষ হতে আর চার ঘণ্টা বাকি। তার মধ্যে আরও ছ’খানা সিন শুট করতেই হবে আজ। না হলে পুরো শিডিউল ঘেঁটে ঘ হয়ে যাবে। এদিকে তিলকদা বলছে, ডিরেক্টর আর চিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের মধ্যে আবার মতানৈক্য!

ছুটলাম বাড়ির ভিতরে। প্রতিটি মিনিট এখন মরণাপন্ন রোগীর শ্বাসবায়ুর মতো দামি। আর দুই বড় খোকা কিনা সেই সময় নিয়ে ইগোর লুডো ম্যাচ খেলছে! এই ইউনিটে আমার পদটির পোশাকি নাম হল এগজিকিউটিভ প্রোডিউসার। আর তার প্রধান কাজটি হল, যেখানে যত জট পাকায়, তার বেয়াক্কেলে সুতো ছাড়ানো। সোজা কথায়, উঠতে-বসতে ফাটা বাঁশের কামড়! এই যেমন, এখন ঝগড়ার ধাক্কা সামলাও।

—এই রইল স্ক্রিপ্ট! এই রইল শিডিউল! এবারে আমি ফাইনালি চললাম!

দোতলায় সিঁড়ির পাশের বৈঠকখানা ঘরটায় ঢুকে দেখি, ধ্রুবদা একতাড়া কাগজসহ হাতের ক্লিপবোর্ডটা দড়াম করে কাঠের টেবিলটার উপর নামিয়ে রাখল। তারপর নিজেও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। তিলকদা জ্যা-মুক্ত তিরের মতো আমার পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে একদম যাকে বলে— কাঁধ চেপে ধরে বসিয়ে দিল আবার। কম্পিত স্বরে বলল, সর্বনাশ! কী ছেলেমানুষি করছ ধ্রুব!

—আমি ছেলেমানুষি করছি? ধ্রুবদা প্রতিবাদে গর্জে উঠল। তারপর আঙুল তুলে সামনে বসা সুশীলবাবুকে দেখিয়ে বলল, আর উনি? উনি তো উৎপীড়ন করছেন আমার উপর। বাচ্চা ছেলেরও অধম।

সুশীলবাবু সত্যিই বাচ্চা ছেলের মতো ঠোঁট ফুলিয়ে অন্য দিকে মুখ করে বসে রয়েছেন। সেই ফোলা ঠোঁট আবার অল্প অল্প নড়ছেও। ইনি আবার রেগে গেলে নিজের মনেই বিড়বিড় করে গাল পাড়তে থাকেন।

—কী হয়েছে কী? আমি গলাখাঁকারি দিয়ে সুশীলবাবুকেই শুধালাম, ‘কীসের সমস্যা?’ ধ্রুবদার দিকে পিঠ করে সুশীলবাবু আমার দিকে তাকালেন। তারপর চোখ পিটপিট করে রুদ্ধস্বরে বললেন, ‘আমার কি একটা ক্রিয়েটিভ ওপিনিয়ন থাকতে নেই? এত সুন্দর দোতলার বারান্দাটা... একটা ট্রলি শট নিলে কি সুন্দর লাগবে বলুন?’

—ট্রলি শট! ধ্রুবদার কণ্ঠ কালবৈশাখীর মেঘের মতো গুমগুম করে উঠল, ‘দোতলায় ট্রলির লাইন তুলে শট রেডি করতে কত সময় চাই জানেন? ওই করতে গিয়ে তারপর যদি সিন লেফ্‌ট ওভার রয়ে যায়— কী ঝামেলায় পড়ব, জানেন কি?’

সুশীলবাবু অতি ব্যথিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। আবার চোখ পিটপিট করে একটু অভিযোগের সুরেই বললেন, ‘আমি ওঁকে কোনও প্রশ্ন করেছি, বলুন? উনি কেন এত উত্তর দিচ্ছেন?’

আমি চোখের কোণ দিয়ে দেখলাম,

সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের পাশে হিন্দুস্থান পার্কের এই বনেদি দোতলা বাড়িটিকে প্রোডাকশন ম্যানেজাররা নাম দিয়েছে ‘জ্যোতি বসুর ভাইয়ের বাড়ি’। কোনও একসময় তাঁদের পরিবার এখানে বাস করতেন। এখন শুটিংয়ের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। আজ সকাল থেকে এখানে ঘাঁটি গেড়েছে আমাদের ইউনিট। আর শুটিং-এ উপস্থিত রয়েছেন বাংলা সিনেমার দুই অসাধারণ প্রবীণ তারকা। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

ধ্রুবদা পুরো ইলেকট্রিক শক লাগা গন্ডার ছানার মতো চেয়ারসুদ্ধ নড়ে উঠল। তাকে বসিয়ে রাখার জন্য তিলকদাকে প্রায় গলা জড়িয়ে ধরতে হয়েছে। সিচুয়েশন সাংঘাতিক ভোলাটাইল বুঝতে পেরে আমি সুশীলদার হাত ধরে আলতো টান দিলাম। বললাম, 'বাইরে আসুন দাদা। কালকেও তো শুটিং আছে। বারান্দা কি পালিয়ে যাচ্ছে? নাকি কাল ট্রলি থাকছে না?'

শিববাড়ির মাঠের যাত্রাপালার একটা মস্ত সুবিধে ছিল যে, স্টেজে স্ক্রিপ্ট ধরে ধরে পরপর সব ক'টা দৃশ্য অভিনয় হত। দু'ঘণ্টার যাত্রা ঠিক দু'ঘণ্টাতেই শেষ। ওই শিক্ষা সম্বল করে নবিশ আমি প্রথম প্রথম শুটিং জগতে এসে, যাকে বলে একদম, চূড়ান্ত কনফিউজড ছিলাম। স্ক্রিপ্টের প্রথম দৃশ্য থেকে কেন এরা শুটিং করে না? একটা সিন শুট আরম্ভ হলে, পাত্রপাত্রীরা কেউই কেন টানা সব সংলাপ বলার সুযোগ পায় না? আচমকা হুংকার দিয়ে 'কাট' বলে ডিরেক্টরমশাই যখন-তখন রসভঙ্গ ঘটিয়ে কী আনন্দ পান? আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, তিরিশ মিনিটের একখানা চিত্রনাট্য শুটিং করতে দু'দিন-তিন দিন সময় কেন লেগে যায়? ভাবতে গেলেই চোখ কপালে ওঠার দশা। উত্তরবঙ্গ স্কুলে, কলেজে এবং ইউনিভার্সিটিতে অল্পবিস্তর নাটক করে আসার বিদ্যেটুকুই তখন আমার একমাত্র সম্বল। ছবি তৈরির বাস্তব জগতে এসে, সে বিদ্যের ভরসায় খুব বেশি মুখ না খোলাই ভাল— এটা আমি শুরুতেই ঠিক করে নিয়েছিলাম। পাড়ার ময়দানে চার-ছক্কা মেরে নিজেকে বেশ কেউকেটো ব্যাটসম্যান মনে করতাম। কিন্তু স্কুল টিমে চান্স পেয়ে ফার্স্ট ম্যাচেই দুটো ইনিংসে গোল্লা! স্পোর্টস স্যার মাথায় চাঁটা মেরে বলেছিলেন, 'পিচ না বুঝেই প্রথম বল থেকে বাউন্ডারি? ভাবিনি, এত বড় ছাগলকে টিমে সিলেক্ট করেছি!'

বলাই বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হোক তা চাইনি। সুতরাং মুখ বুজে শুধু চোখ-কান খোলা রাখার ব্রতে লেগে পড়েছিলাম। অবজার্ভ, অবজার্ভ অ্যান্ড অবজার্ভ। আমি যে টেকনিক্যাল কিছুই জানি না, কেউ সেটা টের পাওয়ার আগেই যেন চুপিসারে এই দুনিয়ার ঘাঁতঘোঁতগুলো শিখে নিতে পারি। এবং সেই সূত্রে কিছুদিনের মধ্যেই বুঝে গিয়েছিলাম যে, শুটিং ফ্লোরের প্রথম পাঠ হল— চিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। যতই ডিরেক্টর সাহেবকে 'ক্যাপ্টেন অব দ্য শিপ' বলা হোক, জাহাজের আসল ইঞ্জিন হল তাঁর প্রধান সহকারী পরিচালক।

সুশীলদাকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম একদম বাড়ির বাইরে। সামনেই একটা পানের দোকান। বললাম, 'পান খাবেন চলুন।'

সুশীলদা তাতে আপত্তি জানালেন না। কিন্তু দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত গজগজ করে চললেন। আজ সকাল থেকে ধ্রুবদা তাঁর একটাও কথা শোনেনি। এমনভাবে একের পর এক সিন শুট হয়ে চলেছে, যে লোকে ডিরেক্টরের দরকারই ভুলতে বসেছে!

উত্তরবঙ্গ স্কুলে, কলেজে এবং ইউনিভার্সিটিতে অল্পবিস্তর নাটক করে আসার বিদ্যেটুকুই তখন আমার একমাত্র সম্বল। ছবি তৈরির বাস্তব জগতে এসে, সে বিদ্যের ভরসায় খুব বেশি মুখ না খোলাই ভাল— এটা আমি শুরুতেই ঠিক করে নিয়েছিলাম। পাড়ার ময়দানে চার-ছক্কা মেরে নিজেকে বেশ কেউকেটো ব্যাটসম্যান মনে করতাম।

অভিযোগ অবশ্য পুরো মিথ্যে নয়। আজ শুটিং-এর দ্বিতীয় দিন চলছে। সিনেমা নয়, এটা নব্বই মিনিটের টেলিফিল্ম। চার দিনের মধ্যে যার শুটিং সম্পূর্ণ করে ফেলতে হবে। 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ছোটগল্পকে ভিত্তি করে সুশীলদা নিঃসন্দেহে অতি চমৎকার চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন। কিন্তু এটা তাঁর প্রথম পরিচালনার কাজ। ফলে টাইট শিডিউলে দিনের বরাদ্দ কাজ শেষ করা সম্ভব হয়ে উঠছে না তাঁর পক্ষে। যেমন, গতকালের আউটডোর সাফারি পার্কে ছোট ছোট প্রায় গোটা কুড়ি সিন রাখা ছিল শিডিউলে। সুশীলদা আপ্রাণ চেষ্টা করেও বারোটার বেশি সিন কমপ্লিট করতে পারলেন না। দিনের আলো ফুরিয়ে গেল, আর আটখানা মতো সিন রয়ে গেল লেফ্‌ট ওভার। আমাদের শিডিউল এবং বাজেট, দুটোই টাইট। সুতরাং আরেক দিনের জন্য এই লোকেশনের ভাড়া গোনা সম্ভব নয়। ফলে ওই আটটা সিন হয় বাতিল করতে হবে, নয়ত অন্যভাবে ম্যানেজ করতে হবে!

এইসব জটিল অঙ্ক একদম ঠিকঠাক মিলিয়ে দেন একজন দক্ষ প্রধান সহকারী, যাঁর মাথা হয় কম্পিউটারের মতো গতিশীল এবং সাফা। স্ক্রিপ্ট হাতে পেলেই লোকেশন আর কাস্ট বুঝে শিডিউলের প্রথম অঙ্কটা তিনি মিলিয়ে ফেলেন, যার ভিত্তিতে বাজেট তৈরি হয় এবং আর্টিস্টের ডেট বুক করা হয়। এবার যুদ্ধের আসল ময়দান অর্থাৎ শুটিং ফ্লোরে এসেও সেই বাজেট রক্ষার প্রধান দায়িত্ব তাঁর। যেমন, আমাদের এই টেলিফিল্মে সুশীলদার লেফ্‌ট ওভার সামলে সময়ের মধ্যে বাকি শিডিউল শেষ করার দায়িত্ব এখন ধ্রুবদার কাঁধে। ফলে বাঘিনি যেমন ছানাদের বাঁচাতে স্বয়ং বাঘের মুখে তর্জন-গর্জন ছুড়ে দিতে দ্বিধা করে না, ধ্রুবদাও তেমন পদে পদে সুশীলদার মতামত নস্যাৎ করছে।

পরিচালক আর প্রধান সহকারীর মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি, মান-অভিমান অবশ্য নতুন ব্যাপার নয়। মধ্যস্থতার দায়িত্বটা তখন প্রোডিউসার বা এগজিকিউটিভ প্রোডিউসারের। পান চিবুতে চিবুতে আমরা দু'জন চলে এলাম শববাহী গাড়িটার পাশে। এটাও আজকের শুটিং-এর প্রপ। সকালের প্রথম শটেই সাবুদি অর্থাৎ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এর কাচের বাক্সে শুয়ে মৃতদেহের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। শবযাত্রীদের দলে আমরা ইউনিটের সবাই হাঁটলাম, কারণ জুনিয়র আর্টিস্টের বাজেট নেই। সেই ভিড়ের ফাঁক থেকে ক্যামেরা ধরেছিল দূরে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে। তাঁর চরিত্রটি বাজার সেরে ফেরার পথে আচম্বিতে দেখতে পায়— মর্নিং ওয়াকের সূত্রে সদ্য আলাপ হওয়া প্রৌঢ়া বান্ধবীর অন্তিম যাত্রা । সেই অভিব্যক্তিই 'দিনান্তে' টেলিফিল্মটির শেষ শট।

—এত ভাল স্ক্রিপ্ট আপনার। তারপর প্রধান চরিত্রে এমন দু'জন মানুষ— যাঁরা বলতে গেলে ইনস্টিটিউশন। তাহলে আনন্দ না করে কেন খেপে ব্যোম হয়ে থাকছেন, বলুন তো?— গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম সুশীলদাকে নিয়ে। এবং মোলায়েম স্বরে সন্ধির উপস্থাপনটাও সেরে ফেললাম।

সুশীলদা কড়াভাবে ভুরু কুঁচকে পান চিবুচ্ছেন, কাঁচাপাকা গোঁফ কাঁপিয়ে। এমন

নিবিষ্ট ভঙ্গি যে আন্দাজ করা যাচ্ছে, পানটিকে উনি ধ্রুবদার মুণ্ডু কল্পনা করে নিয়েছেন। কিন্তু সব শিল্পীর মতো ওঁরও দুর্বলতা নিজের সৃষ্টি। আমি সেই পথেই আক্রমণ শানালাম। বললাম, ‘ধ্রুবদা তো খালি টেনশন করছে— এত ভাল স্ক্রিপ্ট! আজকে কিছুতেই যেন কোনও সিন লেফ্‌ট ওভার না হয়ে যায়। ছবির অঙ্গহানি হতে দেওয়া চলবে না।’

ম্যাজিকের মতো কাজ হল এই সফেদ ঝুটে। সুশীলদা পান চিবানো তো থামালেনই, ভাল করে কথা বলবার স্বার্থে পুরো পানটাই মুখ থেকে ফেলে দিলেন। তারপর রুমালে মুখ মুছে গম্ভীর স্বরে বললেন, ‘হুম! ধ্রুব এ কথা বলছে?’

—বিলক্ষণ বলছে! আপনার সংলাপ তো বাংলা ছবির সোনালি দিনকে মনে করায়।

—এটাও বলছে?

—ইয়ে মানে, মনে হল যেন বলতে শুনলাম।

ব্যাস। এর পরে সুশীলদা একদম মাটির মানুষ। আবেগের সঙ্গে গড়গড় করে বলতে লাগলেন, ‘ধ্রুব একগুঁয়ে হতে পারে, কিন্তু ছেলে বড় ভাল। আহা, একা হাতে সব ঝামেলা সামলাতে হচ্ছে বেচারিকে। চলুন চলুন, ভিতরে যাই। যতটা পারি, হেল্প করি।’

আমি বললাম, ‘দাঁড়ান। আগে প্রমিস করুন, কোনও ঝামেলা পাকাবেন না আর?’

—আরে না রে ভাই!— প্রবলভাবে দু’দিকে মাথা নাড়লেন সুশীলদা। তারপর গোঁফের ফাঁকে সামান্য হেসে বললেন, ‘আমি শুধু বড় এক গেলাস চা নিয়ে বসে বসে অবজার্ভ করব! আহা, ধ্রুব বড় ভাল ছেলে।’

সত্যিই ধ্রুবদা খুব সিনসিয়ার এবং খাটিয়ে মানুষ। প্রতিটি মিনিটকে কাজে লাগিয়ে শটের পর শট নিয়ে চলেছে। একদিকে প্রোডিউসারকে বাঁচানো, আরেক দিকে ডিরেক্টর এবং শিল্পীদের খুশি রাখা— দুটোই তার কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। যদিও, সারাক্ষণ যখন ঘড়ির কাঁটা ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলে চলেছে, তখন এই গুরুদায়িত্ব হাসিমুখে পালন করা সহজ কাজ নয়।

ধ্রুবদার এই কঠিন কাজকে একটু সহজ করার জন্য আমি এবং তিলকদা মিলে আলোচনা করে ঠিক করলাম, আজকের শুটিং-এ আরও হাফ শিফ্‌ট সময় বাড়ানো যাক। তাতে টেকনিশিয়ানদের খানিকটা বেশি টাকা দিতে হবে বটে, কিন্তু তাড়াহুড়োয় শুট করতে গিয়ে সিন ঝুলে যাওয়ার চেয়ে তা-ও অনেক ভাল।

ধ্রুবদা এই সুসংবাদ শুনে বলল, বাঁচালে। সৌমিত্রদা ছ’টা বেজে গেলে আর কাজ করবেন না বলছেন। আমি তাহলে ওঁর সিনগুলো সব পরপর শেষ করে ফেলি!

এটা হল শুটিং-এর সেই টেকনিক্যাল দিক, যেখানে সহকারী পরিচালক তাঁর আসল ক্ষমতা দেখান। কারণ, যে পাঁচ-ছ’টা সিনে সৌমিত্রবাবু আছেন— এখন তাতে শুধু তাঁর সংলাপ ও অভিব্যক্তি শুট করা হবে। দৃশ্যের বাকি সব চরিত্র এখানে অনুপস্থিত। এমনকি, পাঁচটা দৃশ্য হয়ত বাড়ির মধ্যে পাঁচখানা আলাদা লোকেশনে। কিন্তু একই জায়গায় আলো এবং ক্যামেরার অ্যাঙ্গল হেরফের করে সেগুলো শুট করা হবে। তাতে সময়টা বাঁচবে। কিন্তু শুট করতে হবে এমন হিসেব কষে, যাতে পরে বাকি চরিত্রদের নিয়ে আলাদা লোকেশনে শুট করা মূল দৃশ্যের সঙ্গে এই শটগুলো এডিট করে মেলানো যায়। দক্ষ সহকারী পরিচালকরা এই অঙ্কটা ঠিকঠাক মেলাতে জানেন বলেই কঠিনতম পরিস্থিতিতেও তাঁরা হলেন সাচ্চা মুশকিল আসান।

কিন্তু আরও একটা বড় মুশকিল হল! এই দৃশ্যগুলো শেষ হতেই বেজে গেল রাত ন’টা। ফলে টেনশনের দুরুদুরু শুরু আমার এবং তিলকদার বুকে। বাকি আছে শুধু একটা শট। কিন্তু সেটা যদি সাড়ে ন’টার মধ্যে শেষ না হয়, তবে ইউনিটের প্রত্যেককে রাতের খাবার এবং বাড়ি ফেরার ট্যাক্সি ভাড়া দিতে হবে। তিলকদার ভাষায় যার প্রকাশ হল— সাড়ে সর্বনাশ হবে। প্রোডাকশনের চোদ্দোটা বাজবে।

পিংপং বলের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে তিলকদা একবার ধ্রুবদার কাছে যায় তো একবার ক্যামেরাম্যান বাবুলদার কাছে। মিনিটে মিনিটে তার মুখে টাইম আপডেট— ন’টা পাঁচ ধ্রুব, দেখো, আর্টিস্ট রেডি হল কি না। বাবুল, আর দশ মিনিটে লাইট রেডি চাই, তোমায় আলাদা একটা পাঁইট দেব ভাই। আমার সর্বনাশ কোরো না! ন’টা দশ হয়ে গেল!

ঠিক ন’টা পনেরোতে বড় বড় দুটো পাখার হাওয়ায় দরজার সাদা পরদা উড়তে শুরু করল। ধ্রুবদার ইশারায় সুশীলদা হাঁক পাড়লেন, ‘অ্যাকশন’। পরদার ফাঁকে একদম মাপমতো প্রক্ষেপিত আলোতে এক পা হেঁটে এসে দাঁড়ালেন লাল বেনারসি আর সোনালি গয়নায় সজ্জিত সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মুখের হাসিটি মনে করিয়ে দিল সাদা-কালো সিনেমার যুগের সেই অসাধারণ নায়িকাটিকে। এক পলকের জন্য সময়ও যেন থেমে দাঁড়াল। তারপরেই সুশীলদা বললেন, ‘কাট’।

সকালে মৃতদেহ হয়ে যিনি দিনের প্রথম শটটা দিয়েছিলেন— প্রৌঢ় বন্ধুর কল্পনার নববধূ সাজে সার্থক করে দিলেন তিনি সে দিনের অন্তিম শটটিও!

**অভিজিৎ সরকার**

*(ক্রমশ)*

**জার্নি ডেট: ০৬/১০ ও ২৭/১২/২০১৭**

(১৫ দিনের টুর, এনজেপি থেকে এনজেপি)

**২১,৬০০ টাকা জনপ্রতি (প্রাপ্তবয়স্ক)**
**১৮,৮০০ টাকা জনপ্রতি (তৃতীয় ব্যক্তি)**
**১৬,৮০০ টাকা (৫-১১ বছর বয়সী)**
**৯,৬০০ টাকা (২-৪ বছর বয়সী)**

**টুর প্যাকেজে থাকছে**

১) আপ ও ডাউন স্লিপার ক্লাসের ভাড়া
২) ডিলাক্স বাস বা টেম্পো ট্রাভেলার
৩) ফ্যামিলি প্রতি রুম
৪) সব খাবার (ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ইভনিং টি, ডিনার) **(ট্রেনের খাবার বাদে)**

**বেড়াতে চলুন ছোট্ট ছুটিতে**

**২ রাত ৩ দিনের প্যাকেজ টুর**

(শিলিগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি)

| | |
|---|---|
| ওল্ড সিল্ক রুট | : ৪৫০০ টাকা |
| পেলিং | : ৫৫০০ টাকা |
| লোলেগাঁও রিশপ | : ৪৫০০ টাকা |
| গ্যাংটক সঙ্গে ছাঙ্গু | : ৫৫০০ টাকা |
| ডুয়ার্স | : ৪১০০ টাকা |
| দার্জিলিং | : ৪৯০০ টাকা |

*(খরচ জনপ্রতি)*

**প্যাকেজ খরচের অন্তর্গত**

খাওয়া, থাকা, সাইট সিইং

*দ্রষ্টব্য: প্রতি প্যাকেজে অন্তত ৮ জন হতে হবে*

*বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন*

**HOLiDAYAAR**

**Siliguri Office:** Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri 734001 Ph: 0353-2527028, +91 9002772928

**Cooch-Behar Office:**
Ph: +91 9434042969

**Jalpaiguri Office:** Addaghar, Mukta Bhaban, Merchant Road Jalpaiguri 735101
Ph: 03561-222117, 9434442866

# মেগা বাংলা: নিজের ঘরের গল্প না হলেও চেটেপুটে খায় ডুয়ার্সের জনতা

ডুয়ার্স মানেই এনতার নদী-নালা-খাল-বিল-দিঘি-পুকুর, অগুনতি গাছগাছালির ছায়ায় ঢাকা এমন এক আশ্চর্য ভূখণ্ড— বৃষ্টি পড়ে যেখানে বারো মাস। ডুয়ার্সের প্রকৃতির মধ্যে উষ্ণতা নেই, রুক্ষতাও নেই। প্রকৃতির স্নিগ্ধ শ্যামলিমার সৌজন্যে এখানকার মানুষজনের স্বভাবচরিত্র আর যা-ই হোক 'কর্মমুখর' নয়। বরং এদিকের লোক সুযোগ পেলে একটু গল্পগুজব করতে ভালবাসে। নিন্দুকরা বলে 'ল্যাদখোর'। আগে সন্ধেবেলা পাড়ার মহিলাদের পাড়া চষে বেড়ানোর একটা রেওয়াজ ছিল। পানের বাটা সহযোগে চুটিয়ে আড্ডা হত। এক-একদিন এক-একজনের বাড়িতে বসত খোশগল্পের আসর। বাড়িতে বাড়িতে অ্যান্টেনাওয়ালা টিভি আসার পর সেসবে খানিকটা ভাটা পড়ল। অ্যান্টেনা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখা হত ন্যাশনাল চ্যানেল আর বাংলাদেশ টিভি। ধারাবাহিক নাটক, ইদের ম্যাগাজিন প্রোগ্রাম, ইংরেজি জনপ্রিয় টেলিসিরিয়াল দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষার পাঠ শুরু হল সেই তখন থেকে। রাত্তিরে ন্যাশনাল টিভিতে দেখা হত 'হমলোগ' বা 'বুনিয়াদ'। সোপ অপেরা কাকে বলে, বুঝতে শিখল মানুষ।

প্রযুক্তি এগিয়ে গিয়েছে অনেকটাই। এখন বাড়িতে বাড়িতে নয়, ঘরে ঘরে টিভি। ড্রয়িং রুমে 'কুমড়োকুমার' চললে বেডরুমে 'সেক্স ইন দ্য সিটি'। ডিশ অ্যান্টেনা লাগিয়ে নিলে চারশো চ্যানেল। যাদের ডিশ নেই, তাদের জন্য আছে পাড়ার কেব্‌ল অপারেটর। দেখ চাই না দেখ, বাংলা-হিন্দি-ইংরেজি ছাড়াও গুঁজে দেওয়া আছে ভারতের সমস্ত ভাষার সাড়ে বত্রিশ ভাজা চ্যানেল। শুধু চ্যানেল সার্ফ করেই সন্ধে পার করে দেওয়া যায়। নিউজ চ্যানেল বাদে বাকি সব বাংলা চ্যানেলে সন্ধে হলেই শুরু হয় সোপ অপেরা। সুয্যি ঠাকুর পাটে গেলেই হোম মিনিস্টাররা সব কাজ ভুলে টিভির সামনে বুঁদ হয়ে বসে পড়েন। মেগাসিরিয়ালের এমনই আঠা।

সেই আঠা এমনই যে, সকালের খবরের কাগজে চোখ একবার বোলাতে না পারলে যেমন হয়, ঠিক তেমনই মেগাসিরিয়ালের একটা এপিসোড মিস হয়ে গেলেও ফাঁকা ফাঁকা লাগে। ডিপ্রেশনের মেঘ চেপে বসে মাথার মধ্যে। সবকিছুই তখন আলুনি আলুনি লাগে। মেগাসিরিয়াল দর্শনের জন্য কর্তার সান্ধ্য আড্ডা, ছোটজনের হোমটাস্ক, রাতের আহার বা শ্বশুরের হাঁপানির জন্য ইনহেলার— সব ক'টাই রিশিডিউল করতে হয়।

মেগাসিরিয়াল দেখার একটা শর্ত আছে। উনিশশো পঞ্চান্ন সালের হিন্দু ম্যারেজ কোডকে বেমালুম ভুলে যেতে হয়। কেননা টিভিতে যেসব সিরিয়াল এখন চলছে, তার দুনিয়াটা পুরো আলাদা। সেখানে জলজ্যান্ত একটা বউ থাকতে থাকতেই ছেলের বাড়ির লোকজন তার আরও একটা বিয়ে দিয়ে দেয়। ছেলেও 'এ মা ছি, তা কী করে হয়!' বলে লজ্জা লজ্জা মুখে বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়ে। আলটিমেটলি, দুটো বউই কিন্তু এক সংসারে থেকে যায়। তারা বা তাদের অভিভাবকরা কেউ কোর্টে গিয়ে মামলা-মকদ্দমা করার কথা ভাবে না একবারও।

> মেগাসিরিয়াল নিয়ে যাঁরা পিএইচডি করছেন, তাঁরা হয়ত বলবেন, এটা আসলে পারিবারিক ঐক্য। সলিডারিটি। এক ছাদের নিচে একসঙ্গে থাকতে গেলে সবাইকে সবার ব্যাপারে নাক গলাতে দিতে হবে। সবাই সব্বার শোয়ার ঘরে এন্ট্রি নিতে পারবে যখন-তখন।

মেগাসিরিয়াল মানে হপ্তায় পাঁচটা এপিসোড। একটা সিরিয়াল যদি তিন বছর চলে তাহলে মোট এপিসোডের সংখ্যা সাতশো কুড়ি। সে কারণে সাতশো কুড়ি নম্বর এপিসোডে কোন বর বা বউ থাকবে, সেটা কি একশো কুড়ি নম্বর এপিসোডের সময় বলা যায়? উঁহু, যায় না। এর মধ্যে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। দুটো বউয়ের একজনের সঙ্গে প্রযোজকের একটু-আধটু ইয়ে হয়ে যেতে পারে, উলটো দিকে কপালের ফের থাকলে অন্য বউটির সঙ্গে চ্যানেল কর্তার মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কারও যদি ছপ্পড় ফুঁড়ে সৌভাগ্য নেমে আসে এবং সে দেব বা জিতের বিপরীতে নায়িকার ভূমিকায় সুযোগ পেয়ে যায়, তাহলে তার সতী-সাধ্বী সেজে সিরিয়ালের শাশুড়ির খোঁটা শুনতে আর ননদ-ভাজের র‍্যাগিং সহ্য করতে বয়েই গিয়েছে। তখন দুটো উপায়। এক, রাতারাতি বউ বদল। অথবা চরিত্রটিকে হঠাৎ করে গায়েব বা গুম খুন করিয়ে দেওয়া।

এসব ক্ষেত্রে আগে প্লাস্টিক সার্জারি করিয়ে মুখ পালটে দেবার চল ছিল। এখন কেউ ছবির জন্য অন্য কোথাও মাসখানেক শুটিং করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লে তার সিরিয়ালের চরিত্রটাকে অফিসের কাজে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কয়েক মাস পর 'আবার সে এসেছে ফিরিয়া'। এই গায়েব ও ফিরিয়ে আনার কাজটা যাঁরা করেন, তাঁদের বলে স্ক্রিপ্টরাইটার। তবে তাঁর চাকরিটিও যে পাকা, সেটা ভাবার কোনও কারণ নেই। এমন কোনও নিয়ম নেই যে, যিনি একশো বাইশ নম্বর এপিসোডের স্ক্রিপ্ট লিখেছেন, তিনিই সাতশো কুড়ি নম্বর এপিসোডের স্ক্রিপ্ট লিখবেন। এই প্রপঞ্চময় জীবনে সবকিছুই অনিত্য। কখন কী ঘটে যায়, কিস্‌সু বলা যায় না।

মেগাসিরিয়ালের বেশির ভাগ এপিসোডের সিংহভাগ জুড়ে থাকে যৌথ পরিবারের ড্রয়িং রুম। সেখানে মুরুব্বি গোছের কিছু চরিত্র পাড়ার সংবর্ধনাসভায় দাঁড়াবার মতো করে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের ঠিক মাঝখানে

কেচ্ছার গন্ধওয়ালা একটা খবর বোমার মতো ফাটানো হয়। মেগাসিরিয়ালের ক্যামেরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তখন প্রত্যেকটা মুখকেই ঠিক তিরিশ সেকেন্ড করে ঘুরে ঘুরে আলাদা আলাদা ক্লোজ আপে ধরবে রিঅ্যাকশন দেবার জন্য। কেউ ঠোঁট বাঁকাবে, কেউ কেঁদে ভাসাবে, কেউ মুচকি মুচকি হাসবে, কেউ রাগে ফোঁসফোঁস করবে, কেউ ভ্যাবলা মুখে চেয়ে থাকবে। তার মানে, ফ্রেমে যদি ছ'জন থাকে তাহলে মিনিট তিনেক খেয়ে যাবে এভাবেই। অডিয়ো ট্র্যাকে সেই সময়টায় ট্যাং ট্যাং, ঝিং ঝিং ইত্যাদি কড়া ও চড়া মিউজিক যায়।

ধরা যাক, এই জয়েন্ট ফ্যামিলির কোনও ন্যাকাষষ্ঠী মেয়ে প্রেম ভেঙে যাবার দুঃখে শোয়ার ঘরে দোর দিল। তারপর ঘুমের ওষুধ খেয়ে এমন ঘুমিয়ে পড়ল যে, গুষ্টিসুদ্ধু লোকের ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকি শুনতে পাচ্ছে না। এদিকে সবাই ভাবছে, মেয়ে বোধহয় সুইসাইড করে ফেলল। তখন বাড়ির কেউ দরজা ভাঙার চেষ্টা না করে, পালা করে করে এসে দরজায় দুমদাম করবে আর করুণ সুরে 'দরজা খোল মা', 'দরজা খোলো দিদিভাই', 'দরজা খোলো ছোড়দি' ইত্যাদি পালা করে করে বলে যেতে থাকবে। এভাবেই একটা ব্রেক থেকে আর একটা ব্রেকের দিকে এগিয়ে যাবে মেগাসিরিয়াল। তারপর একসময় কেউ কী এক কায়দা করে দরজা খুলে ফেলবে। তখন সবাই একসঙ্গে ঘরে ঢুকে পড়ে দেখবে বিছানায় আচ্ছন্ন মেয়ে। তখন আবার একপ্রস্থ প্রতিক্রিয়া। কেউ মুচকি হাসি, কেউ ঠোঁট কামড়, কেউ হাঁউমাউ কান্না। সে দিনের মতো এপিসোড শেষ।

মেগাসিরিয়াল নিয়ে যাঁরা পিএইচডি করছেন, তাঁরা হয়ত বলবেন, এটা আসলে পারিবারিক ঐক্য। সলিডারিটি। এক ছাদের নিচে একসঙ্গে থাকতে গেলে সবাইকে সবার ব্যাপারে নাক গলাতে দিতে হবে। সবাই সব্বার শোয়ার ঘরে এন্ট্রি নিতে পারবে যখন-তখন। এতে পারিবারিক বাঁধন শক্ত হয়। যৌথ পরিবারে ব্যক্তিগত বলে কিছু থাকতে পারে না। সব সমস্যাই পারিবারিক। সুতরাং যে কোনও ঘটনা, কেচ্ছা, ঝগড়ার জন্য বাড়ির সদস্যদের অন্তত তিরিশ সেকেন্ড করে প্রতিক্রিয়া জানানোর অধিকার আছে। এটাই গণতান্ত্রিক অধিকার।

মেগাসিরিয়ালের দর্শক কারা? পুরুষরা ততটা নয়, যতটা মহিলারা। মেগাসিরিয়াল নিয়ে যাঁরা থিসিস করছেন, তাঁরা হয়ত বলতে পারবেন কারণটা। তবে আরব সাগরের তীরে বসে থাকা মেগাসিরিয়ালের জননী একতা কাপুর নিজেই বলেছেন, ছেলেদের টিভি দেখাটা অনিয়মিত। কোনও টিভি সিরিয়ালের সঙ্গেই তাঁদের মনের যোগ তৈরি হয় না। সেটা হয় মেয়েদের। তাঁরাই মেগাসোপের চরিত্রগুলোকে আপন করে নেন। একতা তাই পরিষ্কার বাণিজ্যিক গাইডলাইন দিয়ে বলেছেন, 'এ দেশের মহিলা দর্শকদের ধরার দুটো রাস্তা আছে। হয় তাঁদের স্বপ্ন দেখান, নয়ত সিরিয়ালের চরিত্রগুলোর সঙ্গে তাঁদের একাত্ম হতে দিন।'

আমাদের মেগাসিরিয়াল দ্বিতীয় রাস্তাটা বেছেছে। সারা ভারতের অন্য সোপ অপেরাগুলোর মডেলে এই মেগা বাংলার সিরিয়ালগুলোতেও ঘরে ঘরে যৌথ পরিবার। প্রত্যেকটা পরিবারই বেশ বড়লোক। এসব বাড়ির সব মহিলা চব্বিশ ঘণ্টা ভীষণ দামি দামি শাড়ি-গয়না পরে থাকে, ঘরদোরের কাজ করার সময় তাদের চুল পরিপাটি করে সেট করা থাকে। মেয়ে আর ছেলে— ঘর ও বাইরের শ্রমবিভাজন এঁরা মোক্ষম বোঝেন। এসব পরিবারের বউ আনা হয় ঘরোয়া দেখে। সেখানে শুক্তোতে কী ফোড়ন দিতে হয়, সেটা জানাটাই বধূবরণের প্রথম যোগ্যতা। এরকম গাঁইয়া, শাড়ি-গয়নার ঢিপি, এটিকেট না-জানা বউকে বর পছন্দ করে না। প্রায় সবারই বাইরে একটা করে স্টেডি গার্লফ্রেন্ড থাকে। সেই গার্লফ্রেন্ডরা আবার সকলেই আলট্রা আধুনিক। সরল গাঁয়ের বধূটি দাঁতে দাঁত চেপে পতিসেবা করে শ্বশুরবাড়িতে সকলের মন জুগিয়ে বিয়েটা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। অতি আধুনিক গার্লফ্রেন্ডটি এই জোড়াতালির সংসার ভাঙার জন্য মুখিয়ে থাকে। সেই পাঁচের দশকের বাংলা ছবির মতোই দুঃখিনী নায়িকা আর রঙ্গিণী ভ্যাম্পের কস্টিউম, নেলপলিশের রং, কেশবিন্যাস, এমনকি টিপের সাইজটা পর্যন্ত আলাদা হয়।

তবে তার চেয়েও আশ্চর্যের, পরিবারের মেয়েরাও ইস্ট বেঙ্গল-মোহনবাগানের মতো দু'দলে ভাগাভাগি হয়ে ঘর বাঁচানো আর ঘর ভাঙানো খেলায় নেমে পড়ে। যে মেগায় এই খেলাটা যত জমে, তার টিআরপি তত বাড়ে। ঠিক এখান থেকেই মেগা বাংলা পুরোদস্তুর একটা মেয়েলি দুনিয়া হয়ে ওঠে। পিতৃতন্ত্রের যত ধান্দা-মতলব-স্ট্র্যাটেজি-চাল আছে— সব বকলমে মেয়েরাই চালে। সিরিয়ালের পুরুষরা তাতে লাট খায়। আসলে মেগা বাংলার এসব সিরিয়ালে ছেলেদের কোনও ভূমিকা নেই। পুরো কেসটাই 'অব দ্য উইমেন, ফর দ্য উইমেন, বাই দ্য উইমেন'।

বিশ্বাস হল না বুঝি? খোঁজ করে দেখুন, এক্ষুনি যত বাংলা চ্যানেলে মেগাসিরিয়াল চলছে, তার কাহিনি-চিত্রনাট্য-পরিকল্পনার দায়িত্বে আছেন মেয়েরাই। এক-একজন দু'-তিনটে করে মেগা লিখছেন এমনও দেখা যায়। সে কারণেই হয়ত একটা সিরিয়ালের গল্প ডালপালা ছড়ানোর ধাঁচটার সঙ্গে অন্যটা হুবহু মিলে যায়। কিন্তু সিরিয়াল যাঁরা দেখছেন, তাতে তাঁদের কিছু যায়-আসে না। ফরসা টুকটুকে মেয়ে যে আধা সাঁওতাল ডায়ালেক্টে কথা বলে, সেটা এই রাজ্যের কোন জেলায় বলা হয় তা নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামান না।

বরং যাঁরা টার্গেট, তাঁরাও লক্ষ্মীর পাঁচালি শিকেয় তুলে, বারের পুজোর কথা ভুলে গিয়ে গোল গোল চোখে শ্বাস বন্ধ করে সে কহানি, কহানি পে টুইস্ট, টুইস্ট পে ফির টুইস্ট চেটেপুটে গিলে নেন। সে গল্প কিছুতেই তাঁদের ঘরের গল্প নয়। তবুও সে কাহিনির আঠায় আটকে পড়েন মেঝেয় গ্যাঁট হয়ে বসা কাজের মাসি আর সোফায় গা এলিয়ে দেওয়া অধ্যাপক গিন্নিটি। মেগা বাংলার এমনই মহিমা যে, সামাজিক অবস্থান ভিন্ন হলেও মনে মনে তাঁরা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন।

ডুয়ার্স বিচিত্রা

# ডুয়ার্সের বিলুপ্তপ্রায় জনজাতি 'খারওয়ার'

ভারতের সংবিধান অনুযায়ী আমাদের রাজ্যে যে সকল জনগোষ্ঠীকে উপজাতি বা Scheduled Tribes হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, তাদের মধ্যে একটি জনজাতি সম্প্রদায় হল 'খারওয়ার'। পশ্চিমবঙ্গে শেষ জাতিগণনা অনুযায়ী এ রাজ্যে খারওয়ারদের জনসংখ্যা হল ২০৫১৪। এই জাতিগণনা অনুযায়ী দেখা যায়, খারওয়ারদের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি মালদহ জেলায়। তার পরের স্থানই হল ডুয়ার্সের। ডুয়ার্সে বসবাসকারী খারওয়ারের সংখ্যা ৩৪২২। কিন্তু নানা কারণে এই জনসংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। ডুয়ার্সের মাল মহকুমার মাল, মাটিয়ালি ও নাগরাকাটা— এই তিনটি ব্লকেই অধিক সংখ্যক খারওয়ার বসবাস করেন। তার মধ্যে চালসা চা-বাগান, জিতি, হিলা, হোপ, নয়াসাইলি, কুর্তি, ভগতপুর, গাঠিয়া, গ্রাসমোর, ক্যারন, চ্যাংমারি, ধরণিপুর, দেবপাড়া, লক্ষ্মীপাড়া, বানারহাট, হাসিমারা, মোগলকাটা, জয়ন্তি প্রভৃতি চা-বাগানে খারওয়ার সম্প্রদায়ভুক্ত আদিবাসীদের বসবাসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। মূলত চা শ্রমিকের কাজের জন্য ব্রিটিশরা বিহারের পালামৌ জেলা থেকে ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে খারওয়ারদের ডুয়ার্সে নিয়ে আসে। পালামৌ জেলার 'খারি-হার' এলাকায় এই জনগোষ্ঠীর লোকেরা বসবাস করতেন বলে এঁদেরকে খারওয়ার বলা হয়। ডুয়ার্স এলাকায় খারওয়াররা এখনও চা শ্রমিকের কাজের সঙ্গেই যুক্ত আছেন।

প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গকে নৃতত্ত্ববিদরা জাতি ও জনজাতির বৈচিত্র্যময় জাদুঘর হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মতে জনজাতি বলতে সেই মানবগোষ্ঠীকে বোঝায়, যারা কোনও নির্দিষ্ট আঞ্চলিক পরিচয় বহন করে নিজস্ব গোষ্ঠীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক সীমাবদ্ধ রাখে। আধুনিক কাজকর্মে অনভিজ্ঞ, বংশানুক্রমে বা অন্য কোনও পদ্ধতিতে নির্বাচিত সর্দারগণ কর্তৃক শাসিত এক ভাষা এক লিপিতে ঐক্যবদ্ধ জাতিভেদ প্রথার কলঙ্ক থেকে মুক্ত হয়েও অপর কোনও জাতি বা উপজাতি থেকে নিজেদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে যত্নবান, উপজাতির ঐতিহ্য, প্রথা, বিশ্বাস ও আচার-আচরণে একনিষ্ঠ নিজস্ব সমাজ বহির্ভূত চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণার স্বাঙ্গীকরণে অনুদার ও সর্বোপরি গোষ্ঠীগত ও আঞ্চলিক সংহতি সম্পর্কে প্রখর চেতনাসম্পন্ন। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, নানা কারণে পেটের তাগিদে, কাজের সন্ধানে এই জনজাতির লোকেরা বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করার ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের ঐতিহ্য, প্রথা, বিশ্বাস ও আচার-আচরণে একনিষ্ঠতা ও নিজেদের সমাজের চিরাচরিত রীতিনীতি ঠিক ঠিকভাবে পালন করতে বা মেনে চলতে পারছেন না। ডুয়ার্সের বিভিন্ন জাতি ও জনজাতির সংমিশ্রণে, দৈনন্দিন জীবনের চলাফেরায়, কাজকর্মে পা মেলাতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে খারওয়ার-সহ অন্যান্য ক্ষুদ্র জনজাতি গোষ্ঠীগুলির জাতিগত ও গোষ্ঠীগত প্রথা, নিয়মনীতি, আচার-আচরণ, উৎসব, নিজস্ব পূজাপার্বণ ইত্যাদি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।

পবন খেরোয়ার, চম্পাগুড়ি ও সুরজমণি খেরোয়ার, হিলা চা-বাগান

খারওয়ার সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের কয়েকটি উপগোষ্ঠী আছে। এগুলি হল— সূর্যবংশী, দৌলাবন্দি, পারবন্দি, খেরি, ভোকতি বা গঞ্জু ও মানঝিয়া। অন্য গোষ্ঠীতে বিবাহের সূত্র ধরে খারওয়ারদের উল্লিখিত গোষ্ঠীগুলিকে টোটেম অনুযায়ী আরও কয়েকটি উপগোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়েছে। এগুলি হল— নাগ, আইয়েন, কারকেট্টা প্রভৃতি। খারওয়াররা পদবি হিসাবে খারওয়ার, খেরোয়ার, সিং, কারকেট্টা বা কেরকেট্টা ব্যবহার করেন। খারওয়ার সমাজ ইন্দো-আর্য ভাষা গোষ্ঠীভুক্ত। ডুয়ার্সের খারওয়াররা নিজেদের দৌলাবন্দি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করেন।

বিবাহের ক্ষেত্রে পূর্বে একজন পুরুষ একাধিক মহিলাকে বিয়ে করতে পারতেন। কিন্তু বর্তমানে সেই প্রথার সম্পূর্ণরূপে বিলোপ ঘটেছে। বর্তমানে একজন পুরুষ একজন মহিলাকে এবং একজন মহিলা একজন পুরুষকেই বিয়ে করতে পারেন। খারওয়ার সমাজে পূর্বে বাল্যবিবাহ প্রথা চালু থাকলেও এখন তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত। খারওয়ার সমাজ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। বিয়ের পর বিবাহিত স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে স্বামীর পিত্রালয়ে থাকেন। বিয়ের পর কোনও কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হলে খারওয়ার সমাজ উভয় পক্ষের অভিযোগ শোনার পর বিচার-বিবেচনা করে শর্তসাপেক্ষে বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে শর্ত হিসাবে স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে যার দোষে এ বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা ঘটতে চলেছে, সেই দোষী স্বামী বা স্ত্রীকে খারওয়ার সমাজে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ দিতে

হয়। বিবাহবিচ্ছেদের পর বিপত্নীক এবং বিধবাদের পুনর্বিবাহ করার প্রথা এই সমাজে প্রচলিত আছে। একজন বিপত্নীক যেমন তার প্রয়াত স্ত্রীর ছোট বোনকে বিয়ে করতে পারে, তেমনই একজন বিধবা তার প্রয়াত স্বামীর ছোট ভাইকে বিয়ে করতে পারে।

খারওয়ার সমাজে যৌথ ও একান্নবর্তী— এই দুই প্রকার পারিবারিক ব্যবস্থাই লক্ষ করা যায়। পিতার অবর্তমানে পৈতৃক সম্পত্তি প্রত্যেক পুত্রের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠপুত্রকে ভাগের একটা অতিরিক্ত অংশ দেওয়া হয়। সে ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠপুত্রকে পারিবারিক, সামাজিক ও পরম্পরাগত নিয়মনীতি, আচার-আচরণ, পূজাপার্বণ, লৌকিকতা ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করতে হয়। খারওয়ার সমাজে পরিবারে শিশু জন্মগ্রহণ করলে ছয় দিন যাবৎ জন্মশৌচ পালন করা হয়। জন্মশৌচ পালন করার পর গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের আয়োজনসহ ভোজন উৎসব পালন করা হয়।

উৎসবপ্রেমী খারওয়ার সমাজে বিবাহ একটি আনন্দ উৎসব। দেখাশোনা ও আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়েই যুবক-যুবতীর বিবাহ নির্ধারণ করা হয়। বিবাহ অনুষ্ঠান সাধারণত মেয়ের বাড়িতেই সম্পন্ন হয়। বিয়ে পর্ব শেষ হলে ওই দিনই বা তার পরদিন মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে আসা হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ছেলে ও মেয়ে উভয় বাড়ির লোকেরা আনন্দমুখরিত হয়ে ওঠে। মাদল, ধামসা, নাগরা ও সানাইয়ের সুরে সুরে, তালে তালে বিবাহ অনুষ্ঠানের গান ও নাচে বিবাহবাসর মুখরিত হয়ে ওঠে। বিবাহ উপলক্ষে আগত অতিথি-অভ্যাগতরা নতুন বস্ত্র পরিধান করেন। দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় দুঃখযন্ত্রণা ভুলে খারওয়াররা এ দিন আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন। খারওয়ারদের বিবাহ উৎসবে ভোজন ও পানীয় অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করে। গুরুজনরা প্রাণভরে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করেন। খারওয়ার সমাজের বিবাহ সাধারণত নিজ গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলেও, সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে। খারওয়ার সমাজের সঙ্গে ভোক্তা বা ভোক্তি বা গঞ্জু সম্প্রদায়ের বিবাহ সম্পন্ন হতে পারে। তা ছাড়া নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী সম্পর্ক স্থাপন করে খারওয়ার সমাজের যুবক-যুবতীরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের আদিবাসী বা অন্য কোনও সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীদের সঙ্গেও বিয়ে সম্পন্ন করছে। বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন একজন পুরোহিত। খারওয়ার সমাজের যাবতীয় আচার ও রীতি মেনে বিবাহকার্য সম্পন্ন করা হয়।

খারওয়ার সমাজে মৃতদেহ আগুনে দাহ করা বা কবর দেওয়া— এই দুই প্রকার নিয়মই আছে। খারওয়ারদের মধ্যে যাঁরা হিন্দুধর্মাবলম্বী, তাঁরা চিরাচরিত নিয়ম-আচার মেনে মৃতদেহ দাহ করেন। খ্রিস্টধর্মাবলম্বী খারওয়াররা মৃতদেহ কবরস্থ করেন। দশ দিন যাবৎ মৃত্যুশৌচ পালন করা হয়। দ্বাদশ দিনে নিজেদের সম্প্রদায়ের আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে ভোজন উৎসব পালন করা হয়।

খারওয়ার সমাজে পুরোহিত (বইগা) হিসাবে মুন্ডা সমাজের একজনকে বা নিজেদের খারওয়ার সমাজের একজনকে নির্বাচিত করা হয়। এই পুরোহিত সমাজের যাবতীয় পূজাপার্বণ, প্রথা, নিয়ম, আচার, বিবাহ, মৃতদেহ সৎকার, শ্রাদ্ধাদিসহ যাবতীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। খারওয়ার সমাজ বিশ্বাস করে যে, ওই পুরোহিত (বইগা) ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি খারওয়ার সমাজকে অশুভ শক্তি, ভূতপ্রেত, পিশাচ ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন, এবং পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিক শান্তিশৃঙ্খলাও বজায় রাখতে পারেন।

খারওয়ার সমাজের আদিবাসীরা সূর্যদেবতার পুজো করেন। সূর্য তাঁদের প্রধান উপাস্য দেবতা। ডুয়ার্সের খারওয়ার সমাজ তাদের নিজস্ব সমাজের শ্রেষ্ঠ ও প্রধান উৎসব হিসাবে 'জিতিয়া' উৎসবকে মান্যতা দেয়। প্রতি বছর ভাদ্র মাসে মহাসমারোহে খারওয়াররা জিতিয়া উৎসব পালন করেন। 'জিতিয়া' গাছের ডাল কেটে এনে একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করে শুদ্ধাচারে সেই ডালটির পুজো করা হয়। সমাজের সকলে নতুন বস্ত্র পরিধান করে এ পূজায় অংশগ্রহণ করেন। পুজোর পর জিতিয়া গাছের ডালটিকে অন্য কোনও স্থানে স্থাপন করা হয় বা পুঁতে দেওয়া হয়। স্থানবিশেষে নদীর জলে বিসর্জন দেওয়া হয়। জিতিয়া পূজা ছাড়াও খারওয়াররা করম, সরহুল হোলি, যাত্রা প্রভৃতি অন্যান্য উৎসবে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রতিটি উৎসবে আনন্দে মেতে ওঠেন।

ডুয়ার্সে খারওয়ার সমাজের জনসংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ হিসাবে জানা গিয়েছে, অন্য উপজাতি ও জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ করা, নিজেদের পদবি পরিবর্তন এবং পাশাপাশি নিজেদের পদবি খারওয়ার বা খেরোয়ার-এর পরিবর্তে অন্য পছন্দসই পদবি গ্রহণ করাই এর মূল কারণ। ডুয়ার্সের খারওয়ার সমাজের শিক্ষার হার খুবই কম। বিশেষ করে মহিলাদের। এর মধ্যেও আশার কথা হল, সম্প্রতি হোপ চা-বাগানের রামতি খারওয়ার ও পূজা খেরোয়ার, রঞ্জন খেরওয়ার এবং চম্পাগুড়ির প্রিয়ঙ্কা খেরোয়ার (ইংরেজিতে অনার্স-সহ) বিএ পাশ করেছেন। প্রিয়ঙ্কা খেরোয়ার WBCS পরীক্ষা দেওয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ শুরু করেছেন। ডুয়ার্সের বিলুপ্তপ্রায় ক্ষুদ্র খারওয়ার জনজাতি গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এটি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

খাওয়ার জনজাতির মাতৃভাষা হল 'সাদরি'। দীর্ঘদিন যাবৎ ডুয়ার্স এলাকায় বসবাসের কারণে সাদরি ভাষার পাশাপাশি তাঁরা হিন্দি, বাংলা, নেপালি প্রভৃতি ভাষাও জানেন, বলতে পারেন ও বোঝেন। খারওয়ারদের সাদরি ভাষার মধ্যে একটা নিজস্বতা বা খারওয়ারি টান আছে। বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করার ফলে এঁদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, উৎসব ও পূজাপার্বণ ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।

**পরাণ গোপ**

**কৃতজ্ঞতা স্বীকার**— পবন খেরোয়ার, চম্পাগুড়ি, নাগরাকাটা। সুরজমণি খেরোয়ার, হিলা চা-বাগান রঞ্জন খেরোয়ার, হোপ চা-বাগান।

# শহীদ বীরেন্দ্র নাথ দত্তগুপ্ত স্মরণে

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্ল্যাটিনাম জুবিলি বছরে 'আগস্ট বিপ্লব উদযাপন কমিটি' কলকাতায় ৯ আগস্ট ২০১৬ তারিখে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে সারা বছর ব্যাপি শহীদ স্মরণে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান সূচনা করে। যা সমাপ্ত হবে ৯ আগস্ট ২০১৭ তারিখে কলকাতায় অনুষ্ঠান করে।

জলপাইগুড়ির প্রথম শহীদ বীরেন্দ্র নাথ দত্তগুপ্তকে শ্রদ্ধা জানাতে এবং আগস্ট বিপ্লব উদযাপন কমিটি যৌথভাবে গত ২০ জুন বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তের ১২৮তম জন্ম জয়ন্তী গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে জেলা পরিষদ হল, জলপাইগুড়িতে পালন করেছে। ওই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে ১৮ জুন রবিবার শহর ও শহরতলীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বসে আঁক, কুইজ ও প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতায় প্রায় ১০০০ ছাত্রছাত্রী অংশ গ্রহণ করে। ২০ জুন মূল অনুষ্ঠানে বিজেতাদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

*বিপ্লবীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করছেন দেবপ্রসাদ রায়*

*শহীদ বীরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত স্মৃতি রক্ষা কমিটির আয়োজিত মিছিল*

২০ জুন দুপুর একটায় সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী, এনসিসি ও নাগরিকদের নিয়ে এক বর্ণাঢ্য মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

পুষ্পমাল্য দিয়ে শহীদকে শ্রদ্ধা জানান সর্বশ্রী অধ্যাপক নিত্যানন্দ দে, সচ্চিদা নন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবীণ সমাজ কর্মী, দীপককৃষ্ণ ভৌমিক প্রাক্তন পুরপিতা, চিরন্তন চট্টোপাধ্যায় উপাচার্য উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ড. আনন্দগোপাল ঘোষ, ড. সৌরভ চক্রবর্তী চেয়ারম্যান এসজেডিএ এবং বিধায়ক, সর্বোপরি দেবপ্রসাদ রায়, এই অনুষ্ঠানের মূল প্রেরণা।

দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশনা করেন শ্রী অনমিত্র মুখোপাধ্যায়। পরে পরিবেশিত হয় বৃন্দগান/নৃত্যনাট্য এবং জটেশ্বর হাই স্কুলের ছাত্ররা মাইম প্রদর্শন করেন।

অতিথিবৃন্দ প্রত্যেকে এই উদযাপনের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং শহীদদের জীবন ও ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। স্মারক পত্রিকা 'চরকা'-র প্রচ্ছদের জমকালো উদ্বোধন হয় মূল অনুষ্ঠানে।

**প্রশান্ত নাথ চৌধুরী**

# প্রকাশিত হল 'নীরজ নাটক' সংকলন

কোচবিহারে প্রকাশিত হল 'নীরজ নাটক' সংকলন। নাটকের বইটি প্রকাশ করলেন '৬০ দশকের অভিনেত্রী ছবি চৌধুরী এবং ডঃ নৃপেন্দ্রনাথ পাল। স্থানীয় সাহিত্যসভায় সে দিন বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খেলাধুলা ও সাহিত্য-সংস্কৃতিজগতের তপন ভট্টাচার্য, সুদীপ্ত মুখার্জি, জ্যোতির্ময় লাহিড়ী, আবু চৌধুরী, বিমান বসু, প্রদোষবিন্দু দাশগুপ্ত, চন্দন চৌধুরী, দেবব্রত আচার্য প্রমুখ। সংগীত, কবিতা, নৃত্য কোলাজ ও নাটকে ভরা এই অনুষ্ঠান সকলের মন ছুঁয়ে গিয়েছে। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল নীরজ বিশ্বাসকে নিয়ে '৫০, '৬০, '৭০ দশকের মানুষদের স্মৃতিচারণা। তাঁদের শ্রদ্ধা জানানোর মধ্যে দিয়ে উঠে এল নীরজ বিশ্বাসের বহুমুখী প্রতিভার প্রকাশ ও অনেক অজানা তথ্য। কোচবিহারে নাটকে আধুনিকতার সূচনা তাঁর হাত দিয়েই হয়েছিল। নীরজ বিশ্বাসের কন্যা মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস জানালেন, এখানে যে ১১টি নাটক রয়েছে তা যদি এখনই সংকলন করা না হত, তবে তা হয়ত হারিয়েই যেত। অনেক কষ্টে এগুলো জোগাড় করা হয়েছে। নীরজ বিশ্বাসের লেখা গানগুলোর কিছু অংশ কোলাজ করে গাইলেন শম্পা ব্যানার্জি। স্বরচিত কবিতা

পাঠ করেন প্রহ্লাদচন্দ্র ভৌমিক, মাধবী দাস, রূপশ্রী কর্মকার, মাধুরী বরগোয়াঁই, রূপক সান্যাল। অগ্নি নাট্যসংস্থা পরিবেশন করে 'অন্যরূপ' নামে একটি নাটক।

**নিজস্ব প্রতিনিধি**

# দৃষ্টিহীন মেধাবীদের পাশে দাঁড়িয়ে পুজোর প্রস্তুতি কালীবাড়িতে

একজন পূজা শাহ্, একজন তাহিদা খাতুন, একজন নুর আলম, আরেকজন তনুশ্রী বিশ্বাস। এরা সকলেই দৃষ্টিহীন। কিন্তু সকলেই মেধাবী। এবারে এরা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে। এদের সারা বছরের পড়ার খরচ দেওয়া শুরু করলেন শিলিগুড়ির ঐতিহ্যমণ্ডিত ও ঐতিহাসিক আনন্দময়ী কালীবাড়ির পরিচালকরা। আর এই সামাজিক কাজ দিয়েই চারণকবি মুকুন্দদাসের স্মৃতিবিজড়িত শিলিগুড়ির ঐতিহ্যমণ্ডিত আনন্দময়ী কালীবাড়িতে দুর্গা পুজোর প্রস্তুতি শুরু হল। রথযাত্রার দিন মুকুন্দদাস। ১৯২৫ সালে তিনি প্রথম শিলিগুড়ি আসেন। সেই সময়ই তিনি শিলিগুড়ি ডিআই ফান্ড মার্কেট এলাকায় 'মা আনন্দময়ী কালীবাড়ি' নাম দিয়ে কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। তাঁরই প্রয়াসে কাশীপুর থেকে কালীবিগ্রহ এনে ১৯২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি আনন্দময়ী কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা হয়। সেই কালীবাড়ি সরকার হেরিটেজ হিসাবেও ঘোষণা করেছে। সেখানকার দুর্গা পুজো এবার ৮৬ বছরে পা দিয়েছে। রথযাত্রার দিন নিয়ম মেনে সেখানে মা দুর্গার কাঠামোপুজো হয়েছে। আর

থেকেই কাঠামোপুজোর মাধ্যমে শুরু হয়েছে প্রতিমা তৈরির কাজ। পুজো আসার আগে দুর্গা মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে গত ৩ জুলাই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় মন্দির চত্বরে। আর তার অঙ্গ হিসাবে শিব, দুর্গা, লক্ষ্মীর উপর গীতি আলেখ্য পরিবেশন করেন শিলিগুড়ি সুভাষ পল্লির ফুলেশ্বরী নন্দিনীর শিল্পীরা। নন্দিনীর সম্পাদিকা কণিকা দাস ছাড়া মলয় চক্রবর্তী, রত্না চক্রবর্তী, বুলবুল বোস, শিল্পী পালিত, মিথু আইচ, গার্গী বসু, বনানী বর্মনের সঙ্গে কল্পনা ভট্টাচার্য তাঁদের সংগীত প্রতিভা মেলে ধরেন। তবলায় ছিলেন রানা সরকার।

পরাধীন ভারতে দেশের জন্য গান গাইতে শিলিগুড়ি আসতেন চারণকবি উলটো রথের দিন দুর্গা মন্দিরের শিলান্যাস হল। স্বামী শিবপ্রেমানন্দজি এর শিলান্যাস করেন। মন্দির কমিটির সম্পাদক ভাস্কর বিশ্বাস জানিয়েছেন, ৩ জুলাই তাঁরা চারজন কৃতী প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা দিয়েছেন। এরা সকলেই দৃষ্টিহীন। তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়। তাঁরা মনে করেন, মানুষের সেবাই হল দেবীর আসল সেবা। পুজোর ক'দিন তাঁরা দুঃস্থদের হাতে নতুন জামাকাপড় তুলে দেবেন। খাওয়ানো হবে অভুক্তদের। শিলিগুড়ি ফুলেশ্বরী নন্দিনীর সম্পাদিকা কণিকা দাস জানিয়েছেন, তাঁরা এই অনুষ্ঠানে শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতীর উপর বন্দনা করেছেন।

**বা. ঘো.**


## এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

**General Rates for Display Ads (INR)**

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

**Special Rates for Local Trade only**
Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

**Mechanical Details:** Full Page Bleed {18.9cm (W) X 27.07 cm (H)}, Non Bleed {15.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {15.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {7.5 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {4.8cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 15.5 cm (W) X 5.2 cm (H), 1/4 Page 7.5 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {4.8 cm (W) X 11.2 cm (H)}

*Rates are effective from April 1, 2017 issue*

**বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন**
**কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩**
**উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬**

এখন ডুয়ার্স

# আপনার বাচ্চার প্রিয় খাদ্য চিকেন বিপদ ডেকে আনছে না তো?

আমাদের বাড়ির ছোটরা চিকেন ছাড়া আর কিছুই যে মুখে তুলতে চায় না! তাই ফ্রিজে আর কিছু থাকুক না থাকুক, চিকেনের স্টক রাখা হয় পর্যাপ্ত পরিমাণে। শাকসবজি অনেক দূরের ব্যাপার, আপনার বাচ্চার মাছ বা ডিম কিছুতেই রুচি নেই। সকাল-সন্ধে, বছরভর ওদের একটাই মেনু পছন্দ, তা হল চিকেন। আমাদের প্রচলিত ধারণা রয়েছে, মাটন বা রেড মিটের চাইতে চিকেন অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর, কম ক্যালোরিযুক্ত খাবার। অতএব চিকেন একটি নিরাপদ খাদ্য। কিন্তু সাম্প্রতিককালে উন্নত দেশগুলিতে ক্রমাগত গবেষণায় সেই ধারণা যে একে একে ভেঙে যাচ্ছে কেবল তা-ই নয়, চিকেন ডিশে বিপদের সংকেত ক্রমশই ঘনীভূত হচ্ছে।

গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, চিকেনের জন্যই আজকাল আকছার পেটের গন্ডগোল দেখা দিচ্ছে। আর এই সংক্রমণ ঘটছে মূলত চিকেনের বিষ্ঠা বা পটি থেকে। যে পরিবেশে পোলট্রি চিকেন পালন করা হয়, ঝুড়িতে রেখে চালান করা হয় বা বাজারে সেই ঝুড়ি থেকে বার করে কেটেকুটে আপনার থলেতে দেওয়া হয়, পুরোটাই অসম্ভব নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর, ভয়ংকর সব ব্যাকটেরিয়ার ডিপো। আমাদের দেশের কথা ছেড়েই দিন, আমেরিকার বড় বড় দশটি শহরে বছরকয়েক আগে সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, অর্ধেক চিকেনই এই বিষ্ঠার ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত। জলে সেদ্ধ করলেও এইসব ব্যাকটেরিয়া মরে না। চিকেন চিবানোর সঙ্গে সঙ্গে তা ঢুকে যাচ্ছে আপনার পাকস্থলীতে, অন্ত্রে। যাঁরা এই চিকেনে হাত দিয়ে মশলা মাখছেন, রান্না করছেন, সেইসব ব্যাকটেরিয়া তাঁদের মধ্যে দিয়ে সংক্রামিত হচ্ছে অন্যান্য খাবারে, বাসনকোশনে— এক কথায় ভাবলেই গা গুলিয়ে ওঠে। একবার ভাবুন, যাঁরা পোলট্রির কাজ করছেন বা আশপাশে থাকছেন, তাঁদের রোগের সম্ভাবনা কতটা বেশি।

আর এই রোগের তালিকা কিন্তু কেবল পৈটিক গোলযোগেই সীমাবদ্ধ নেই, সেটা আরও দুশ্চিন্তার কারণ।

**চিকেন ওজন বাড়ার একটি বড় কারণ**

যাঁরা ডায়েটিং জারি রাখতে চিকেন স্টু খাচ্ছেন নিয়মিত, তাঁদের জানাই, সাম্প্রতিক সমীক্ষায় ইউরোপে দেখা গিয়েছে, এক বিশাল সংখ্যক শিশুর মধ্যে ওজন বাড়ার প্রবণতা বেশি, আর তার অন্যতম মূল কারণ চিকেন। ১০০ গ্রাম চিকেন থেকে আসে ১৫০ ক্যালোরি।

আপনার প্রিয় সন্তান, যে কিনা পড়াশোনার চাপে খেলাধুলার সময়ই পায় না, রোজ চিকেন খাচ্ছে দু'বেলা, তার মোটা না হওয়ার কোনও কারণ আছে কি?

অবশ্য নাদুসনুদুস সন্তানটি যে আপনার বড্ড প্রিয়। সে ক্ষেত্রে মাথায় রাখুন, চিকেন কেবল ওজনই বাড়ায় না, ক্যানসারের সম্ভাবনাও বাড়িয়ে তোলে। ইউরোপে পাঁচ লক্ষ মানুষের উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে, রোজ ৫০ গ্রাম চিকেন খেলেও প্যানক্রিয়াস ক্যানসারের সম্ভাবনা ৭২ শতাংশ বেড়ে যায়। কেবল গ্রিলড বা ফ্রায়েড চিকেনেই নয়, চিকেন কারিতেও বেড়ে যেতে পারে পায়ু ক্যানসার বা কোলন ক্যানসারের বিপদ। চিলি চিকেনের স্রষ্টা চিনেও সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, নিয়মিত চিকেন ব্রেস্ট ক্যানসারের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে ভীষণভাবে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে যখন দেখা যাচ্ছে, চিকেনে মেলে আর্সেনিকের মতো বিষ, তো আমাদের মতো ভিখিরি দেশের কথা তো বলাই বাহুল্য। ফাস্ট ফুডের চিকেনে ইতিমধ্যেই যে পরিমাণ আর্সেনিক মিলেছে, তাতে রোগের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। অথচ কেএফসি-ম্যাকডোনাল্ডের বিজ্ঞাপনী দাপটে ক'টা কাগজ আর সত্যি কথাটা প্রচার করার সাহস পায় বলুন!

**কিডনি স্টোনেও চিকেন?**

অতি সম্প্রতি ইউরোপে পঞ্চাশ হাজারের বেশি কিশোর-কিশোরীর মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে, নিয়মিত চিকেন খাওয়ার সঙ্গে কিডনিতে পাথর জমার একটা সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। আছে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা। ইউরোপের আটটি দেশে এ নিয়ে সাড়ে তিন লক্ষ মানুষের উপর সমীক্ষার ফল হল, বেশি চিকেন খেলে ডায়াবেটিস ধরতে পারে যে কোনও সময়, আর মহিলাদের ক্ষেত্রে নাকি এর সম্ভাবনা যথেষ্ট বেশি।

এতসব শুনে আপনার মনে হতেই পারে, দুর ছাই, তবে খাবটা কী? বিশ্ব জুড়ে এর একটাই উত্তর এখন, যতটা সম্ভব শাকসবজির দিকে ঝুঁকে পড়া, সঙ্গে টুকটাক মাছ চলুক। অনেক হয়েছে, আর না হয় না-ই খেলেন অসুস্থ চিকেন, না-ই বা সংক্রমণ ঘটালেন নিজের সন্তানদের মধ্যে। হেল্‌থ ফুডের তকমা দেওয়া বাজারি পণ্যের ব্যবহার নিত্যনতুন বিজ্ঞাপনী চমকে বেঁচে থাকুক, কিন্তু নিজের ও সংসার-পরিজনদের সুস্থ রাখতে গেলে অগ্রণী হতে হবে যে নিজেকেই। রোগ ধরার আগে স্বাস্থ্যের সুরক্ষা সর্বদাই স্বাগত।

**মৃন্ময়ী মহাপাত্র**

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস
চিত্রকথা 'ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস'। পর্ব-১৪। এই চিত্রকথা কোনওভাবেই ছোটদের জন্য নয়। আর কাহিনির সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজতে যাওয়া অনভিপ্রেত।
কোচবিহারের ডেপুটি যা জানাল
ভৈরব বাগচি। কবি ও অধ্যাপক। কয়েকদিন হল নিখোঁজ। মনে করা হচ্ছে, তাঁকে কেউ কিডন্যাপ করেছে। কিন্তু কেন?
বিখ্যাত কবি চালুক্য পুলকেশী। তিনি বাগচিবাবুর নিখোঁজ হওয়ার খবর পেয়ে পুলিশকে জানিয়েছেন যে, লাভায় তাঁর সঙ্গে দু'জন 'সন্দেহজনক' কবি দেখা করতে আসে। নিজের বইয়ের নাম প্রসঙ্গে চালুক্যবাবু ওদের ভৈরব বাগচির কথা বলেন।
লেডি চিতার একটি ঘাঁটিতে সম্প্রতি হানা দিয়েছিল পুলিশ। কাউকে ধরতে পারেনি। কিন্তু গদাধর চাটুজ্যের লেখা 'নব্বই দিনে কবি হন' বইয়ের একটা কপি উদ্ধার করেছে।
আপনি কি তিনটে ঘটনার মধ্যে কোনও যোগসূত্র পাচ্ছেন?
পাচ্ছি বটে!
কবি হওয়ার বইতে চালুক্যবাবুর নাম আর লাভার একটি রিসর্টের ঠিকানা মিলেছে।
??!
আমি নিশ্চিত যে, ওই পালিয়ে যাওয়া দলের দু'জন কবি সেজে চালুক্যর কাছে যায়।
তারা জানতে চেয়েছিল, ওঁর নতুন বইয়ের নাম কে দিয়েছে। সেই সূত্রে বাগচিবাবুর নাম আসে।
তারপর তারা বাগচিকে কিডন্যাপ করে..., কিন্তু কেন?
এটাই বুঝতে পারছি না।
চালুক্যবাবুর বইয়ের নাম 'চিতাকাঠে চিতা'। হুম! রহস্য কি এখানেই?

EKHON DUARS, Vol-4, Issue-8 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.